দাম : দশ টাকা

# স্বস্তিকা

নেপালকে অশান্ত করতে কৌশলী চাল চীনের
পৃ: ১৪

বালুচিস্তানের আইলান কুর্দিরা মালালার বিবেকও ছুঁতে পারলো না
পৃ: ২৯

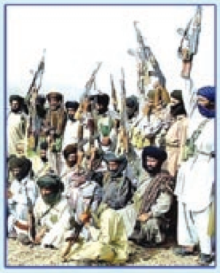

৬৮ বর্ষ, ১০ সংখ্যা।। ২৩ নভেম্বর ২০১৫।। ৬ অগ্রহায়ণ - ১৪২২।। website : www.eswastika.com

# কোন পথে ভারত-নেপাল সম্পর্ক

# স্বস্তিকা

*।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।*

৬৮ বর্ষ ১০ সংখ্যা, ৬ অগ্রহায়ণ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

২৩ নভেম্বর - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৭,

Website : www.eswastika.com

**সম্পাদক : বিজয় আঢ্য**

**সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল**

**প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত**

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

**দাম : ১০ টাকা**

**বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।**

**Postal Registration No.**-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।


# সূচীপত্র


**সম্পাদকীয়** ▯ ৫

**সংবাদ প্রতিবেদন** ▯ ৬-৯

**সদর্পে বলতে হবে ইসলামের নামে বর্বরতা বিশ্ববাসী আর বরদাস্ত করবে না** ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

**খোলা চিঠি : এগিয়ে বাংলা, ১০০-র মধ্যে ১৫০** ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

**বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল কী বার্তা বহন করছে** ▯ দেবব্রত ঘোষ ▯ ১২

**নেপাল : হিমালয়বক্ষে ভারতের দ্বারপাল, অধুনা কি বিপথগামী?** ▯ অম্লানকুসুম ঘোষ ▯ ১৪

**নেপালকে অশান্ত করতে কৌশলী চাল চীনের, শান্তি রক্ষায় পাল্টা ভারতেরও** ▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ১৭

**পুণ্যক্ষেত্র নীলকণ্ঠ পাহাড়** ▯ নীলমণি চক্রবর্তী ▯ ২১

**জিনসরের প্রাচীন মন্দির** ▯ ড. প্রণব রায় ▯ ২৩

**পাক অধিকৃত কাশ্মীর পাকিস্তানের কবল থেকে মুক্ত হতে চায়** ▯ মুজফ্ফর হোসেন ▯ ২৭

**বালুচিস্তানের আইলান কুর্দিরা মালালার বিবেক ছুঁতে পারলো না** ▯ সাধন কুমার পাল ▯ ২৯

**প্রসঙ্গ নেতাজী** ▯ ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ▯ ৩১


## নিয়মিত বিভাগ


**চিঠিপত্র : ১৯-২০** ▯ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** ▯ **অঙ্গনা : ২৬** ▯ **অন্যরকম : ৩৩** ▯ **সুস্বাস্থ্য: ৩৫** ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৮** ▯ **রঙ্গম : ৩৯** ▯ **শব্দরূপ : ৪০** ▯ **চিত্রকথা : ৪১** ▯ **প্রাসঙ্গিকী : ৪২**

# স্বস্তিকা

## আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

## গোমাংস ভক্ষণের পক্ষে যুক্তি কি শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা নয় ?

গবাদি পশুকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা বা না-করা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে নানা খবর প্রচারিত হচ্ছে। অনেকেরই ধারণা, বেদের যুগে গোমেধ যজ্ঞে গোরুকে নাকি হত্যা করা হোত। সত্যিই কি তাই ? বৈদিক শব্দ এবং লৌকিক সংস্কৃত শব্দের অর্থ ভিন্ন, আর এই নিয়েই যত বিপর্যয়। সংস্কৃতে ‘ধেনু’ শব্দের অর্থ গোরু হলেও বৈদিক অর্থ হলো বাণী বা শব্দ। ‘মেধ’ শব্দের বৈদিক অর্থ দীপন বা জ্যোতি। বৈদিক শব্দকোষে গো শব্দের অর্থ হলো অদিতি (সূর্য)। তাই গো-হত্যা এবং গোমাংস ভক্ষণ নিয়ে এবারের বিশেষ বিষয়— গোমাংস ভক্ষণের পক্ষে যুক্তি কি শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা নয় ?


বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE PURE®

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

*জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী*

# সম্পাদকীয়

## অসহিষ্ণুতার সহিষ্ণুতা

‘সবার উপর মোদীই সত্য’ বলিয়া তাঁহাকে যতই কটাক্ষ করা হউক না কেন সৌজন্য বিচক্ষণতায় তাঁহার সামনে অথবা পার্শ্বে কেহ এখনও পৌঁছাইতে পারে নাই। নির্বাচনে খারাপ ফলের পরে সকলে যখন পলাইয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন তখন নরেন্দ্র মোদী ব্যতিক্রম। পাটনায় নীতীশ কুমারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিবেন তিনি। কারণ ভোট প্রচারের সময় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বিহারের জন্য যে বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করিয়াছিলেন, সেটি যাহাতে বিজেপির পরাজয়ের পরেও বলবৎ থাকে তাহার জন্যই প্রধানমন্ত্রীর এই উপস্থিতির ইচ্ছা প্রকাশ। মোদী সরকারের অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলিও জানাইয়া দিয়াছেন যে বিহারের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র সরকার যে আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করিয়াছে তাহা পূরণ করিবার ব্যাপারে তাঁহারা দায়বদ্ধ। আর এই কারণেই প্রধানমন্ত্রীও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া বার্তা দিতে চাহিয়াছেন। ভোটে খারাপ ফল হইলেও বিহারের উন্নয়নের ব্যাপারে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন সেই ব্যাপারে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পরাজয়ের প্রভাব সেই প্রতিশ্রুতির প্রতিবন্ধক হইবে না। তাঁহার উন্নয়নের স্লোগান বাক্‌সর্বস্ব নয়। প্রকৃত অর্থেই উন্নয়ন। ইহার নামই সহিষ্ণুতা। ইহার নামই গণতান্ত্রিকতা। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় সরকার রেল প্রকল্পের ক্ষেত্রে এইবার যে ১০০ শতাংশ এফডিআই অনুমোদন করিয়াছে তাহার সুফলও ভোগ করিবে বিহার। বিহারের মারহোরা এবং মাধেপুরায় ডিজেল এবং ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ কারখানা গড়ার প্রস্তুতি শুরু হইতেছে। এই উদ্যোগে বিহারে প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ আসিবে। উল্লেখ্য, ভারতে কোনো রেল প্রকল্প ক্ষেত্রে এইটাই হইতে চলিয়াছে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিদেশি বিনিয়োগ। প্রধানমন্ত্রীর ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ উদ্যোগের অন্তর্গত এইটাই এখনও পর্যন্ত দেশের গণপরিবহণ ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় অঙ্গের বিনিয়োগ। মারহোরা ডিজেল লোকোমোটিভ কারখানায় আগামী ১০ বছরে এক হাজার ডিজেল ইঞ্জিন তৈরি করা সম্ভব হইবে আর মাধেপুরায় ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ কারখানায় আগামী ১১ বছরে ৮০০টি ১২ হাজার অশ্বশক্তি ক্ষমতাসম্পন্ন ইলেকট্রিক রেল ইঞ্জিন তৈরি হইবে বলিয়া রেল মন্ত্রকসূত্রে জানানো হইয়াছে। সোনিয়া গান্ধী মোদীকে স্বৈরতান্ত্রিক বলিলেও কংগ্রেস আমলের গতানুগতিক ধারা বর্জন করিয়া বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিকে বাদ দিয়া কেন্দ্রীয় সরকার রেলে বিহারে বিদেশি বিনিয়োগের যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছে তাহা উল্লেখযোগ্য। মনে রাখিতে হইবে বিহারে ৩৮ শতাংশ মানুষ বিজেপিকে ভোট দিয়াছে। এবং বিজেপি যে অভিযোগ করিয়াছিল লালুকে ভোট দিলে পুনরায় জঙ্গলের রাজত্ব ফিরিয়া আসিবে তাহা ইতিমধ্যেই ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। গোপালগঞ্জের এক ব্যবসায়ীকে সম্প্রতি অপহরণ করা হইয়াছে। তবুও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় রাজ্যের উন্নয়নে কেন্দ্রের যে দায়িত্ব রহিয়াছে প্রধানমন্ত্রী তাহা পালন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। কংগ্রেসী আমলে বিরোধী দলের রাজ্য সরকারগুলিকে বিপাকে ফেলিবার যে পরম্পরা চালু করিয়াছিল কংগ্রেস, তাহা নস্যাৎ হইয়া যাইবার ফলে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নীতীশের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থাকিবার সম্ভাবনায় লালুপ্রসাদ যাদব এবং সোনিয়া গান্ধীর গোঁসা উপস্থিত হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী সহযোগিতা না করিলে তাঁহারা ঘোলাজলে মাছ ধরিবার সুযোগ পাইতেন। বিষয়টা লইয়া নীতীশ ফাঁপরে পড়িয়াছেন। প্রধানমন্ত্রীর বদান্যতায় আপাতত তাঁহার সম্মান রক্ষা হইয়াছে। সহিষ্ণুতা লইয়া অপরকে জ্ঞান দিতে হইলে নিজেদেরও যে সহিষ্ণু হইতে হয় সেই বোধবুদ্ধি ইহাদের এখনও হয় নাই।

## সুভাষিতম্

*শশিনা চ নিশা নিশয়া চ শশি*
*শশিনা নিশয়া চ বিভাতি নভঃ।*
*পয়সা কমলং কমলেন পয়ঃ*
*পয়সা কমলেন বিভাতি সরঃ।।*

*চাঁদ আছে বলেই রাত্রির শোভা, আবার রাত্রি আছে বলেই চাঁদের শোভা। আর উভয়ের জন্য আকাশের শোভা বৃদ্ধি পায়। জল আছে বলেই পদ্মের শোভা আর পদ্ম আছে বলেই জলের শোভা। আর উভয়ের জন্যই জলাশয়ে শোভা বৃদ্ধি পায়।*

# শ্রদ্ধার পাত্র কখনই ছিলেন না টিপু সুলতান—সুব্রহ্মনিয়াম স্বামী

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** বিজেপি নেতা সুব্রহ্মনিয়াম স্বামী সম্প্রতি বেঙ্গালুরুর এক সভায় বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন। ইতিহাসবিদ স্বামী বলেন, প্রামাণ্য তথ্য অনুযায়ী টিপু সুলতান ছিলেন ফরাসীদের ভৃত্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই মহীশূর শাসক সম্পর্কে তিনি বলেন, টিপুর মধ্যে তাঁর স্মৃতি-সংরক্ষণ করে রাখার মতো কোনো গুণ বা যোগ্যতা কোনোটাই ছিল না।

তাঁর বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রসঙ্গ টেনে স্বামী বলেন, টিপু ফ্রান্সের ভৃত্য হিসেবে বৃটিশের বিরুদ্ধে লড়াই

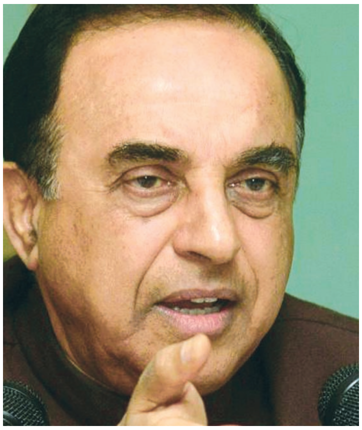

সুব্রহ্মনিয়াম স্বামী

করেছিলেন। তিনি কখনই স্বাধীনভাবে বৃটিশ বিরোধী সংগ্রাম করেননি। ইতিহাস উদ্ধৃত করে স্বামীর বক্তব্য—“উনবিংশ শতাব্দীর সেই কালপর্বে নেপোলিয়ন আফ্রিকায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন আফ্রিকাতেই সেই যুদ্ধ তিনি জিতবেন। এরপর তিনি ভারতে ঢোকা মনস্থ করেন। এই সুবাদে তিনি টিপুকে সঙ্গে নিয়ে বৃটিশের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাবার পরিকল্পনা করেছিলেন এবং সেই মর্মে চুক্তি হয়েছিল।”

The open platform for Netaji শীর্ষক এক আলোচনা সভার প্রাক্কালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এই মন্তব্য করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কর্ণাটক সরকার সম্প্রতি টিপু সুলতানের জন্মদিন উদযাপনের আয়োজন করেছিল। এই উদযাপনকে ঘিরে কোডাগু জেলার বন্টিওয়াল অঞ্চলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পারস্পরিক সংঘর্ষে দু' জনের মৃত্যু হয়। এই সূত্রে স্বামী বলেন, “টিপু সুলতানের ওপর কোনো প্রামাণ্য জীবনী গ্রহণযোগ্য বা প্রমাণিত তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা কিছুই লভ্য নয়। কেবলমাত্র তাঁর সেনাধ্যক্ষদের বা বন্ধু-বান্ধবদের লেখা কিছু প্রামাণ্য চিঠিপত্র মাত্র সংগৃহীত আছে।”

স্বামী আরও জানান যে রকেট উৎক্ষেপণ নিয়ে টিপুকে সবিশেষ কৃতিত্ব দেওয়া হয়, যদিও টিপুর বহু আগে থেকেই তৎকালীন ভারতের রাজারা তা প্রয়োগ করেছিলেন। বিগত ২১৬ বছরের মধ্যে কোনো সরকারকেই টিপু সুলতানের জন্মদিন পালন করতে দেখা যায়নি। যেহেতু কর্ণাটকের নির্বাচন এগিয়ে আসছে, সেখানে সম্ভাব্য পরাজয়ের হতাশা থেকে মুখ ঘোরাতেই কংগ্রেসের এই রাজনৈতিক চাল।

### টিপু-সুলতানের জন্ম-জয়ন্তীকে কেন্দ্র করে অশান্ত কর্ণাটক

# প্রাণ গেল ভিএইচপি কার্যকর্তার

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** মহীশূরের শাসক টিপু সুলতানের ১৬৫তম জন্ম-বার্ষিকীকে কেন্দ্র করে অশান্তির আবহ তৈরি হয়েছে কর্ণাটক জুড়ে। মুসলমান ভোটব্যাঙ্কের লোভেই রাজ্য সরকার টিপু সুলতানের জন্মবার্ষিকী পালনের নক্কারজনক সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের অভিমত। সম্প্রতি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এক কার্যকর্তাকে প্রাণ দিতে হলো এর জন্য। ঘটনার সূত্রপাত গত ১০ নভেম্বর। পশ্চিমঘাটের কফি জেলা হিসেবে খ্যাত কোডাগু-র মাদিকেরিতে টাউন হলে টিপু জয়ন্তী আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। বাইরে মিছিলের কোনো প্রশাসনিক অনুমতি ছিল না আয়োজকদের। তা সত্ত্বেও শুধুমাত্র এলাকায় প্ররোচনা ছড়াবার উদ্দেশ্যে মিছিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। স্থানীয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্য ও কার্যকর্তারা এর প্রতিবাদ করলে তাঁদের ওপর পাথর ছোঁড়া হয়। এই ছোঁড়া পাথরে মাথায় ভীষণ চোট পান কুথাপ্পা নামে এক বিশ্ব-হিন্দু পরিষদ কর্মী এবং তিনি প্রাক্তন সরকারি কর্মীও বটে। একইসঙ্গে পুলিশ টিপু সুলতানের জন্ম-জয়ন্তী আয়োজকদের বিনা অনুমতিতে মিছিলের ক্ষেত্রে প্রথমে নীরব দর্শকের ভূমিকা নিলেও, এর প্রতিবাদকারীদের হঠাতে তাদের কর্মতৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো। লাঠি চার্জ থেকে শুরু করে কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটানো কিছুই বাকি ছিল না। ভি এইচ পি-র অভিযোগ— পুলিশের লাঠির ঘা-য়েই মাথায় চোট পান কুথাপ্পা আর তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। কর্ণাটক সরকারের টিপু সুলতানের জন্মজয়ন্তী পালনের ঘোষিত কর্মসূচি ইতিমধ্যেই সারাদেশে সমালোচিত হয়েছে। রাজ্য বিজেপির সভাপতি প্রহ্লাদ যোশী স্পষ্টই একে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার সংখ্যালঘু তোষণ নীতি বলে অভিহিত করেছেন। রাজনৈতিক মহলও এর পেছনে ভোট-রাজনীতির খেলাই দেখছেন। বিজেপি ইতিমধ্যেই ব্যাঙ্গালুরুর ক্ষমতা কেন্দ্র বিধান সৌধে জন্ম-জয়ন্তী অনুষ্ঠান বয়কট করেছে। নাগরিক সমাজও এখন এই আন্দোলনে সামিল হওয়ায় মুসলমান-তোষণকারীরা মরিয়া হয়ে উঠেছে।

# পুরশুড়ায় কালীপূজার আগেই প্রতিমা ভাঙলো দুষ্কৃতীরা

দুষ্কৃতীদের ভাঙা সারি সারি কালী প্রতিমা।

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** সম্প্রতি দীপাবলির আনন্দঘন মরশুমে হিংসার সাক্ষী রইল হুগলী জেলার পুরশুড়া ব্লক। এই ব্লকের হারুয়া গ্রামে কালীপূজার ঠিক আগেই নির্মীয়মান ২৫টি কালী প্রতিমার মুণ্ডুচ্ছেদনের ঘটনা ঘটেছে। ২৫টি ক্লাবের পূজার জন্য ওই প্রতিমাগুলি তৈরি করা হচ্ছিল। স্থানীয় হিন্দুদের মধ্যে এই নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। উত্তেজিত জনতা ১০ নভেম্বর সকালেই তারকেশ্বর রোড অবরোধ করলেও পুলিশ তাদের হঠিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে প্রতিমাগুলির পুনর্নির্মাণ বা নতুন প্রতিমার খরচ বহন করার আশ্বাস দেয়।

যদিও এখনও পর্যন্ত কাউকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে উঠতে পারেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই ব্লকেই গত ১৫ অক্টোবর দুর্গা প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছিল।

## পাকিস্তানে মৌলবাদীদের প্রাণনাশের হুমকিতে এপারে হিন্দু-পরিবার

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** পাকিস্তানে মৌলবাদীদের প্রাণনাশের হুমকিতে থাকতে না পেরে এপারে চলে আসতে বাধ্য হলো একটি হিন্দু পরিবার। পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশের থারপারকার জেলার ওয়াডিয়ো গ্রামের বাসিন্দা হীরালাল, তাঁর স্ত্রী এবং তাঁদের সাত ছেলেমেয়ে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন বলে সূত্রের খবর। যে এলাকায় তাঁরা থাকতেন সেটি ভারত-পাক সীমান্তের নিকটবর্তী। এদেশে তাঁরা গুজরাটের কচ্ছ প্রদেশে সীমান্তের নিকটস্থ রাপার গ্রামে চলে এসেছিলেন। আইন মোতাবেক ভারতীয় সীমা-সুরক্ষা বল (বি এস এফ) এঁদের গ্রেপ্তার করলেও বিতর্ক থামছে না।

## কি বললেন ?

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** সারা বিশ্বের ইসলামিক সংগঠনের (Islamic World body) তরফে 'the organisation of Islamic co-operation (OIC)'-এর সর্বোচ্চ সেক্রেটারি জেনারেল আয়াদ মাদানি প্যারিসের সন্ত্রাসী হামলাকে তীব্রতম ধিক্কার জানিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এও বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক দুনিয়ার সকল মানুষকে একজোট হয়ে সন্ত্রাসবাদের এই বাড়বাড়ন্তকে যে কোনো মূল্যে রুখতে হবে।' এই সন্ত্রাসীরা আদতে সমগ্র মানবতার জঘন্যতম শত্রু বলে তিনি উল্লেখ করেন।

## কি বললেন ?

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** উত্তর প্রদেশ সরকারের প্রবীণমন্ত্রী ও সমাজবাদী দলনেতা আজম খান প্যারিসে সন্ত্রাসী হামলায় নিরীহ নাগরিকদের মৃত্যু পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন, বিশ্বের 'সুপার পাওয়ার অর্থে বিশেষ শক্তিধর দেশগুলির এবার বোঝা উচিত যে এই সন্ত্রাসী হামলা তাদের কৃতকর্মের প্রতিক্রিয়া'। অবশ্য এই আক্রমণকে নিন্দা করার পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, 'মধ্যপ্রাচ্যের তেল সমৃদ্ধ দেশগুলির সম্পদ লুঠ করে আর ইউরোপের শহরগুলিকে আলোয় সজ্জিত করা যাবে না।' সন্ত্রাসবাদীদের পক্ষ অবলম্বন করে তিনি আরও হুঙ্কার দেন যে প্যারিস শহর কেবলমাত্র মদ ও বেলাল্লা পার্টি কালচারের জন্য বিশ্বখ্যাত, সেই শহরের এই প্রাচুর্য প্রদর্শনের জন্য মধ্যপ্রাচ্যের ইরাক, সিরিয়া, লেবানন বা ইরাকের তেলক্ষেত্রগুলির ওপর কব্জা বজায় রেখে অর্থ লুঠ করা চলতে পারে না।

## গো-হত্যা বন্ধ এবং গো-সংরক্ষণের দাবিতে সচেতন নাগরিক মঞ্চের সভা

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** গত ১৪ নভেম্বর গো-হত্যা বন্ধ এবং গো-সংরক্ষণের দাবিতে সচেতন নাগরিক মঞ্চের নামে এক বিরাট মিছিল কলকাতা কলেজ স্কোয়ার থেকে শুরু হয়ে ধর্মতলায় শেষ হয়।

অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এই মিছিলে পা মেলান। পরে রাণী রাসমণি রোডে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে গৌড়ীয় মঠের বন্ধুগৌরব মহারাজ, ধর্মজাগরণ মঞ্চের সনাতন মাহাতো, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী দীনদয়ালজী, আর্য সমাজের আচার্য যোগেশ শাস্ত্রী এবং সমাজ সেবিকা শ্রীমতী সুভদ্রা দিদি গোহত্যার বিরুদ্ধে এবং গো-সংরক্ষণের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন। সভার পর চার সদস্যের এক প্রতিনিধি দল আশুতোষ মণ্ডলের নেতৃত্বে রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীকে স্মারকলিপি জমা দেন। প্রতিনিধি দলে নিশীথ দত্ত, অজয় নন্দী (ব্যবহারজীবী), শক্তিশেখর দাস ছিলেন। এই মিছিল ও সভা প্রকাশ্য দিবালোকে গোমাংস ভক্ষণ ও কলকাতার রাস্তার ধারে গোহত্যার প্রতিবাদ করে।

## সি বি এস ই বিদ্যালয়গুলিতে জাতীয় সঙ্গীত বাধ্যতামূলক করল বোর্ড

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** ভারতের বৃহত্তম স্কুল বোর্ড সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সি বি এস ই) তাদের অনুমোদিত ১৬ হাজার বিদ্যালয়ে প্রার্থনার সময় জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করল। সব বিদ্যালয়ে দিনের কাজ প্রারম্ভের পূর্বে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার বিষয়ে ২০১৪-এর ২২ সেপ্টেম্বর দেওয়া কলকাতা হাইকোর্টের আদেশ মান্য করার কথাও ওই বিজ্ঞপ্তিতে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও জাতীয় সঙ্গীতকে আরও জনপ্রিয় এবং জাতীয় পতাকার প্রতি ছাত্রছাত্রীদের মনে শ্রদ্ধার ভাব জাগ্রত করার বিষয়ে বিদ্যালয়গুলিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রার্থনার প্রচলন রয়েছে। তার মধ্যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে স্তোত্র বা স্ব স্ব ধর্মের প্রার্থনা গীত হওয়ার রেওয়াজ রয়েছে। একজন সি বি এস ই আধিকারিকের কথায়, এই বিজ্ঞপ্তির ফলে সমস্ত বিদ্যালয়গুলিতে এবার থেকে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হবে। সি বি এস ই-এর এই সিদ্ধান্তকে বহু বিদ্যালয় স্বাগত জানিয়েছে।

## স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার সম্মান প্রত্যর্পণ করল বৃটেন

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** সম্প্রতি বৃটেনের আইনজীবীদের অগ্রণী সংগঠন ইনার টেম্পল ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী ব্যারিস্টার শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে তাঁর প্রতি মরণোত্তর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করল। ঠিক যেমন ভাবে এই সমিতি ১৯৮৮ সালে মহাত্মা গান্ধীর উপর জারি করা নিষেধাজ্ঞা (১৯২২) প্রত্যাহার করেছিল। লন্ডনের 'দি টাইমস' পত্রিকায় চিঠি লেখার দায়ে বর্মার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। কেননা তাঁর এই কাজ ইনার টেম্পল-এর নিয়মাবলীর বিরুদ্ধে ছিল। ওই চিঠিতে বর্মা লিখেছিলেন, বৃটিশদের শাসন থেকে নিজেদের মুক্ত করার স্বাধীনতা ভারতীয়দের আছে।

দ্য ইন (The Inn) আশা প্রকাশ করেছে,

শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার এই পুনর্বহাল বা অতীত গৌরব ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি বৃটেন ও অন্যান্য দেশের ভারতীয়দের সঙ্গে বর্তমান সম্পর্ক আরও দৃঢ় করবে।

১৮৫৭ সালে ৪ অক্টোবর গুজরাটের কচ্ছ জেলার মাণ্ডভি শহরে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার জন্ম। সেখানে তাঁর নামে এখন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও রয়েছে। অক্সফোর্ড-এর বেলিডন কলেজের তিনি ছাত্র ছিলেন। ইংল্যান্ডে ভারতীয় ছাত্রদের জন্য উত্তর লন্ডনে তিনি ইন্ডিয়ান হাউস প্রতিষ্ঠা করেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি ইন্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটিও প্রতিষ্ঠা করেন। 'ইন্ডিয়ান সোশিওলজিস্ট' নামে পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। এই পত্রিকাতেই তিনি ভারতের স্বাধীনতার দাবি জানিয়ে এসেছেন। ভারতের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁদের স্মরণে ইন্ডিয়া হাউসের মধ্যেই একটি স্মারকস্তম্ভ প্রতিষ্ঠারও তিনি দাবি জানিয়েছিলেন। ১৯৩০-এর ৩০ মার্চ মাসে জেনেভাতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সংবাদ প্রতিবেদন

# চীনের উপরাষ্ট্রপতির সঙ্গে মমতা ব্যানার্জীর চুক্তিতে কেন্দ্র সন্দিহান

**নিজস্ব প্রতিনিধি**॥ সম্প্রতি চৈনিক উপরাষ্ট্রপতি লি উয়ানচাও-এর সঙ্গে কলকাতার ইকো পার্কে হওয়া এক বিশেষ দ্বিপাক্ষিক সাক্ষাৎকারকে ঘিরে দিল্লীতে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। সংবাদে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) থেকে রাজ্যের তরফে বিপুল অর্থ ধার নিতে চান। এই প্রসঙ্গে তিনি চীনা রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে এক প্রস্থ আলোচনা সেরেছেন বলে প্রকাশ। এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের বিদেশ দপ্তর খতিয়ে দেখছে দেশের কোনো অঙ্গরাজ্যের প্রধান সরাসরি কোনো বিদেশি ঋণ এইভাবে গ্রহণ করতে পারে কিনা?

সম্প্রতি নেপালে অস্থিরতার পরিপ্রেক্ষিতে সে দেশে ভারতকে হটিয়ে চীন একচেটিয়া জ্বালানি তেল সরবরাহের অধিকার নিয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে চীনা প্রতিনিধির আচরণ কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত সন্দিগ্ধ চোখে দেখছে। মোদী সরকার ও মমতার অভ্যন্তরীণ সমীকরণ যাই হোক না কেন সেই সুযোগে মমতাকে অর্থনৈতিক সাহায্যের মাধ্যমে চীন দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নাক গলাবার মতলব করছে কিনা পররাষ্ট্র বিশেষজ্ঞরা তা খতিয়ে দেখছেন। অন্যদিকে মমতা যে সর্বভারতীয় স্তরে মোদী-বিরোধী একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ফ্রন্ট তৈরির চেষ্টাও করছেন সে সম্পর্কেও কর্তৃপক্ষ ওয়াকিবহাল।

প্রসঙ্গত, ক্রমাগত সম্পদ সৃষ্টি করার পরিবর্তে রাজ্যের অর্থ সস্তা রাজনৈতিক স্বার্থে দান-খয়রাতের মাধ্যমে জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ রাখতে তিনি কোষাগার প্রায় নিঃশেষ করে ফেলেছেন। এই কারণেই তিনি বারবার কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের তরফে দেয় বাৎসরিক ঋণের সুদ মকুব করার জন্য দরবার করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে যখন রাজ্যের সব রকম উন্নয়নমূলক কাজকর্মই স্তব্ধ হয়ে আছে সেখানে চীনা প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনার পর মুখ্যমন্ত্রীকে যথেষ্ট নিশ্চিন্ত বলে মনে হয়েছে, এমনটাই জানা যায়।

চীনা উপরাষ্ট্রপতি লি উয়ানচাও-এর সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী।

সূত্র অনুযায়ী মমতা ও চীনা উপরাষ্ট্রপতির মধ্যে কেন্দ্রের প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-চীন-ভারত ও মায়নামারের মধ্যে অর্থনৈতিক করিডর নির্মাণ নিয়েও আলোচনা হয়। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের ঢাকা ও মায়নামারের মান্দালয় হয়ে কলকাতার সঙ্গে চীনের সমৃদ্ধ শহর Kunning-এর সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হবে বলে তাঁরা আশা প্রকাশ করেন।

## জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কেস তুলে নেওয়ার উদ্যোগ অখিলেশ সরকারের

**নিজস্ব প্রতিনিধি**॥ অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে আদালত থেকে বেকসুর খালাস পেল ছয়জন হুজি জঙ্গি। এই ছয়জন জঙ্গির মধ্যে পাঁচজনই পশ্চিমবঙ্গের, বাকি একজন উত্তরপ্রদেশের বিজনোর জেলার। এই নিয়ে দু' বছরে উত্তরপ্রদেশের এসটিএফ-এর বিভিন্ন অভিযোগে ধৃত ১৭ জন জঙ্গিকে প্রমাণের অভাবে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো আদালত। পুলিশের পেশ করা চার্জশিট নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে আদালত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সম্প্রতি খালাসপ্রাপ্ত হুজি জঙ্গি জালালুদ্দিন ওরফে বাবু ভাই-য়ের প্রসঙ্গে আদালত পুলিশকে বলেছে, রেলের টিকিট, সিপিও বিল যেগুলি বাবুভাই এবং নওশাদের থেকে পাওয়া গিয়েছিল বলে দাবি করা হয়েছে, সেগুলি পুলিশ উদ্ধার করছে না কেন? এইরকমভাবেই মহম্মদ আলির জমা করা গ্রেনেড বা বিস্ফোরক নিয়েও সন্দেহ দেখা দিয়েছে। উল্লেখযোগ্য, এই ১১ জন জঙ্গি বিভিন্ন সময় দেশবিরোধী কাজের জন্য দীর্ঘ সময় জেলে ছিল। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, অখিলেশ যাদবের সরকার এই এগারো জনের বিরুদ্ধে মামলা তুলে নেওয়ার পদক্ষেপ নিলেও এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে তা স্থগিত আছে।

# সদর্পে বলতে হবে ইসলামের নামে বর্বরতা বিশ্ববাসী আর বরদাস্ত করবে না

**গূঢ় পুরুষের কলম**

প্রথমে আল কায়দা। এখন আই এস। ইসলামি সন্ত্রাসবাদের একই মুদ্রার দুই পিঠ। আল কায়দা ধ্বংস করেছিল নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের দুটি গগনচুম্বী বহুতল ভবন। কেড়ে নিয়েছিল কয়েক হাজার মানুষের প্রাণ। তারই দোসর ইসলামিক স্টেট মানুষের তাজা রক্তে ভাসালো প্যারিসের রাজপথ। এরপরেও ভারতের ছদ্ম সেকুলার বুদ্ধিজীবীরা বলবেন ইসলাম শান্তির ধর্ম। ভারতের হিন্দুরা নাকি অসহিষ্ণু। ইসলাম সহিষ্ণুতায় বিশ্বাসী। ভারতের হাজার বছরের ইতিহাস অন্য কথা বলে। মুসলমান বাদশা নবাবেরা হিন্দুদের উপর যে অত্যাচার চালিয়েছিল বিশ্বের ইতিহাসে তার দ্বিতীয় নজির নেই। ইসলামের ধর্মগ্রন্থ কোরানে কমপক্ষে ১০৯টি সুরা বা অনুচ্ছেদ আছে যেখানে বলা হয়েছে যে আল্লার শ্রেষ্ঠত্বে অবিশ্বাসী কাফেরদের হত্যা করাই সাচ্চা মুসলমানের পবিত্র কর্তব্য। ইসলাম হত্যা ও মৃত্যুর উপাসক।

ফ্রান্স রক্তস্নাত। কারণ ফরাসি সরকার সর্বপ্রথম ইরাক ও সিরিয়ার শরণার্থীদের আশ্রয় দিতে তার দেশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত খুলে দেয়। ফরাসিরা চিরকালই উদারমনস্ক অতিথিবৎসল খোলা মনের মানুষ। জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্পকলায় ইউরোপের শ্রেষ্ঠতম জাতি। ভারতে যদি বৃটিশ শাসনের পরিবর্তে ফরাসিদের শাসন থাকতো তবে ভারতের সার্বিক উন্নয়ন দ্রুত ঘটতো। পণ্ডিচেরী এবং চন্দননগর ছিল ফরাসিদের হাতে। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাল সময়েও এই দুই ফরাসি কলোনির মানুষজনকে নিপীড়ন সহ্য করতে হয়নি। সামরিক শক্তিতে দুর্বল হওয়ার জন্য বৃটিশের অন্যায় জুলুম চন্দননগরের ফরাসি শাসকদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানতে হয়েছে। সে অন্য কথা। ফরাসি শাসকদের সহায়তায় চন্দননগরের তাঁতশিল্প সারা বিশ্বের নজর কেড়েছিল। সেই উদারমনস্ক ফরাসি জাতি আজ ইসলামের অত্যাচারে বিপন্ন। এটা এমন একটা সময় যখন ছদ্ম সেকুলারের খোলসে আত্মগোপন করে আত্মরক্ষা করা যায় না। সদর্পে বলতে হবে ইসলামের নামে বর্বরতা বিশ্ববাসী আর বরদাস্ত করবে না। ইসলাম যে ভাষা বোঝে সেই ভাষাতেই বর্বরতার জবাব দিতে হবে। ইসলামের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে শরিক হতে হবে বিশ্বের সমস্ত অ-মুসলমান দেশকে। শুধু মৌখিক সহানুভূতি জানিয়ে কর্তব্য সারলে চলবে না।

আল কায়দার অবসানের পর ইসলামিক স্টেটের উত্থান ইরাকের মাটিতে। এদের প্রধান নেতা আবু বকর আল বাগদাদি ঘোষণা করেছে যে, আল্লার ফরমানে সে একজন খলিফা। আই এসের একমাত্র লক্ষ্য এশিয়া ও ইউরোপে খিলাফত শাসন পুনরায় বলবৎ করা। শরিয়ত হবে একমাত্র রাষ্ট্রধর্ম। আই এসের প্রধান মুখপাত্র শেখ আবু মহম্মদ আল আদনানি গত সেপ্টেম্বর মাসে এক চরম বিবৃতিতে ফ্রান্স ও কানাডায় বসবাসকারী সমস্ত মুসলমান বাসিন্দাদের নির্দেশ দেয় যে তারা তাদের এলাকায় অবিশ্বাসী কাফেরদের চোরাগোপ্তা আক্রমণের মাধ্যমে হত্যা করে।

নিশ্চিতভাবে বলা যায় প্যারিসের আই এস গুপ্তঘাতকদের আশ্রয় দিয়েছিল স্থানীয় মুসলমান বাসিন্দারা। স্থানীয় মানুষের সাহায্য ছাড়া সিরিয়া থেকে ঘাতকরা অস্ত্রসহ প্যারিসে এসে হত্যালীলা চালাতে পারতো না।

প্যারিসে রক্তবন্যা দেখে ভারতে আমরা আতঙ্কিত সন্ত্রস্ত। এটাই স্বাভাবিক। কারণ, আই এসের হিট লিস্টে ভারতের নাম উপরের দিকে আছে। ভারত সফট টারগেট। পাকিস্তান আই এস সন্ত্রাসবাদীদের সব রকম মদত দিতে প্রস্তুত। তাই ভারতীয় নাগরিকরা মোটেই নিরাপদ নয়। অথচ আমাদের সেকুলার বুদ্ধিজীবীরা বোঝাতে চাইছেন যে, ইসলাম অহিংসায় বিশ্বাসী। প্যারিসের ঘটনা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এই ঘটনা দিয়ে ইসলামকে দোষারোপ করা ঠিক নয়। যদি তাই হয় তবে কলবুর্গি হত্যা এবং আখলাখির ঘটনাও বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এই দিয়ে ১২৫ কোটি ভারতবাসীর গায়ে অসহিষ্ণুতার তকমা লাগিয়ে দেওয়াটা ঠিক নয়। ইসলামকে সহিষ্ণুতার প্রতীক, অহিংসার পূজারি এইসব কথা যারা বলে তাদের উচিত একবার কোরান ও হাদিস পড়ে দেখা। কারণ, এই দুটি ধর্মগ্রন্থ সমস্ত মুসলমান সমাজের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। ধর্মীয় বিচারে বসতে গেলে গীতা, বাইবেল এবং কোরান অবশ্যই পড়তে হবে। বুঝতে হবে। ভাবতে হবে। তারপর মতামত দিলে সর্বজনের গ্রহণযোগ্য হবে। অবশ্য বামপন্থী কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীরা কোনও ধর্মগ্রন্থ পড়েন না। তাঁরা যতই গোমাংস খেয়ে নিজেদের সেকুলার বলে জাহির করেন তাঁরা যে আল্লার শ্রেষ্ঠত্বে অবিশ্বাসী সে কথা মুসলমানরা ভালভাবেই জানেন। ■

# এগিয়ে বাংলা, ১০০-র মধ্যে ১৫০

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী,
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
নবান্ন, হাওড়া

ম্যাডাম,

আপনি একসময় এই ডাকটা পছন্দ করতেন না। কিন্তু এখন শুনছি আমলাদের কাছে ম্যাডাম শুনতেই আপনি বেশি পছন্দ করেন। তাছাড়া এ চিঠি আমার তৃণমূলনেত্রী দিদিকে নয়, এটা সত্যি সত্যিই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে। মনে আছে লোকসভা ভোটের আগে খুব শোনা যাচ্ছিল একটা কথা। গুজরাট মডেল। আসলে নরেন্দ্র মোদী সার্বিকভাবে গুজরাটের যে উন্নয়ন ঘটিয়েছেন তার প্রশংসা করেছিল সবাই। আপনি অবশ্য তখন বলেছিলেন, গুজরাট মডেল আসলে ভাঁওতা। বাংলাকে দেখে গোটা দেশকে শিখতে হবে উন্নয়ন কাকে বলে। এর জবাবে আমার যতদূর মনে আছে নরেন্দ্র মোদী কিছু বলেননি। তবে জবাবটা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর। দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সকলের কাজের প্রশংসা করে এমনকী আপনার নাম উল্লেখ করে বলেছিলেন, তিনি চান বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের প্রতিটি রাজ্য মডেল হয়ে উঠুক। সবার সঙ্গে সবার উন্নয়নের প্রতিযোগিতা হোক। তাহলে দেশের উন্নয়ন হবে।

কিন্তু আপনি সে পথে না হেঁটে সম্প্রতি দেখিয়ে দিলেন পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে অন্য কোনো রাজ্যের তুলনা হতে পারে না, তুলনা হতে পারে গোটা দেশের সঙ্গে। অন্য রাজ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় না গিয়ে সরাসরি দেশের সঙ্গে লড়াই। মানে কেন্দ্রের সঙ্গে লড়াই। দারুণ বুদ্ধি ম্যাডাম! আপনি ভালোই জানেন যে এতে আর যাই হোক হারের ভয় নেই। আপনি বলেছেন, মাথাপিছু আয় থেকে শুরু করে কৃষি, শিল্পের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতীয় হারকে অনেকটাই পিছনে ফেলে দিয়েছে আপনার সরকার।

আপনি এদিন বলেন, "ওরা পিছিয়ে আমরা এগিয়ে।" ওরা মানে কেন্দ্র আর আমরা মানে রাজ্য। জাতীয় স্তরে বৃদ্ধির হার যেখানে ৭ শতাংশ, সেখানে আমাদের ১০.৪৮ শতাংশ। শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রেও আমরা এগিয়ে। শিল্পে জাতীয় বৃদ্ধির হার ৮ শতাংশ, এ রাজ্যে ১০ শতাংশ। আর কৃষিতে জাতীয় বৃদ্ধির হার ১ শতাংশ, আমাদের ৬ শতাংশ। আপনার আরও দাবি, সম্পদবৃদ্ধির দৌড়েও পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় হারকে পিছনে ফেলে দিয়েছে। বেড়েছে মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির হার। ওরা ৬, আমরা ১২।" কিন্তু এখানেই উঠেছে প্রশ্ন।

প্রশ্ন এক, অর্থনীতির নিয়ম মেনে জাতীয় হারের সঙ্গে কি কোনও একটি রাজ্যের তুলনা হতে পারে? যেখানে দেশের কৃষি-শিল্প কিংবা পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি মাপতে গেলে উত্তর-পূর্বের কমজোরি রাজ্যগুলিও হিসেবের তালিকায় চলে আসে, সেখানে স্বাভাবিক বিচারেই দেশের গড় কম হতে বাধ্য। তাহলে কীভাবে শুধু গড়ের নিরিখে গোটা দেশের সঙ্গে একটি রাজ্যের তুলনা সম্ভব?

প্রশ্ন দুই, জাতীয় গড়ের চেয়ে বেশি মানেই কি এগিয়ে যাওয়া? ধরা যাক, কোনো একটা পরীক্ষায় ৫০ জন ছাত্র গড়ে ৫৫ নম্বর পেল। তারই মধ্যে এক জন পেল ৬৫। এক্ষেত্রে ওই ছাত্র গড়ের বেশি পেল ঠিকই, কিন্তু অন্যরাও এককভাবে কত পেল, তা দেখতে হবে। হায়েস্ট নম্বর হয়তো তা ৯৫, তাহলে?

প্রশ্ন তিন, ক্রিকেট খেলায় কোনো একজন ব্যাটসম্যান একশো বলে সেঞ্চুরি করলে তাঁর স্ট্রাইক রেট ১০০। আবার যিনি এক বলে এক রান করেছেন, তাঁরও তা-ই। তাহলে কি দু'জনের পারফরম্যান্স একই?

না, ম্যাডাম এসব উত্তর আপনার কাছে জানতে চাইছি না। কারণ, এগুলো অর্থনীতির বিষয়। রাজনীতির নয়। কিন্তু একটা সোজা অঙ্ক কিছুতেই মিলছে না। আপনি বলছেন, "অনেক দপ্তর পরিকল্পনা বাজেটের দেড়শো শতাংশ টাকা খরচ করে ফেলেছে।"

এই ১৫০ শতাংশ ব্যাপারটা একটু খোলসা করে বলবেন কি? আমি মধ্যবিত্ত মানুষ, একটু ব্যাপারটা শিখে গেলে সংসারের বরাদ্দ ১০০ শতাংশ টাকায় ১৫০ শতাংশ কাজ মিটিয়ে নিতাম।

**—সুন্দর মৌলিক**

# বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল কী বার্তা বহন করছে

**দেবব্রত ঘোষ**

বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফল আমাদের দেশকে এক ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন করেছে। বিহারের জাতপাতভিত্তিক রাজনীতির সঙ্গে মিশেছে ধর্মীয় মৌলবাদ যা আসলে ক্রমবর্ধমান ইসলামিক মৌলবাদ। মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় একচেটিয়া ভোট পেয়েছে লালুপ্রসাদ যাদব-নীতিশকুমার-কংগ্রেসের জোট এবং ভোটের ফল প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী (যিনি মুসলিম কার্ড ব্যবহারে দেশের সবচাইতে উদ্যোগীদের অন্যতম) এই মহাজোটকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এই প্রতিবেদকের বিশ্বাস, বিহার নির্বাচনে বিজেপি-র ভরাডুবির একটা বড় কারণ হলো বিহার রাজ্যে বিজেপির সাংগঠনিক দুর্বলতা ও মাত্রাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস। আংশিক কারণ হলো দলের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং লালু- নীতিশকুমার-সোনিয়া শিবিরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য চাণক্যনীতি অবলম্বন না করা। নরেন্দ্র মোদী কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পরে ভারতের কোনো বিজেপি শাসিত রাজ্যে দাঙ্গা হয়নি। যে সব দাঙ্গা হয়েছে সেগুলো সব অ-বিজেপি শাসিত রাজ্যে, অথচ সব মিডিয়া, ডান-বাম সব দল বিজেপিকেই দায়ী করছে। এই নিরন্তর অপপ্রচারের বিরুদ্ধে কেন্দ্র বা রাজ্য বিজেপি কোনো সঠিক প্রচার করতে পারেনি। মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি অতি অবশ্যই একটা বড় কারণ যেটা কখনোই বিজেপির পক্ষে যাবে না। কারণ বিজেপি ও আর এস এস জাতীয়তাবাদী সংগঠন আর মুসলমান সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ আজও শুধুমাত্র মুসলমান রয়ে গেছে, ভারতীয় হয়ে ওঠেনি এবং তারা যাতে কোনোদিন ভারতীয় না হয়ে শুধু মুসলমান হয়েই থাকতে চায় তার জন্য কংগ্রেস-সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক দলগুলো নিরন্তর চেষ্টা চালাচ্ছে যাকে বিজেপি আটকাতে পারেনি।

সমগ্র দেশেই মুসলমান জনসংখ্যা দ্রুতহারে বেড়ে চলেছে, পাল্লা দিয়ে চলেছে অনুপ্রবেশ। বিশেষ করে অসম ও পশ্চিমবাংলায় তাদের বেশ কিছু অংশ পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহার বা ঝাড়খণ্ডেও অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম চালাচ্ছে। বিহারে নীতিশ কুমারের জমানায় উন্নয়ন হয়নি সেটা সত্যি নয়। উন্নয়ন হয়েছে অন্তত লালুপ্রসাদের জমানার 'লাঠি জিসকা ভৈস উসকা'-র চাইতে বেশি। কিন্তু জাতপাতভিত্তিক রাজনীতি আজও বিহারের প্রধান পরিচয় যেটা অদূর ভবিষ্যতে এক মারাত্মক আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনবে, যেটা আমাদের রাজ্য পশ্চিমবাংলায় হয়ে চলেছে— সৌজন্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত তৃণমূল কংগ্রেস। লালু-নীতিশের রাজনীতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতির সাথে খাপ খেয়ে যায় এবং হিন্দু সমাজের মানুষদের কোনোরকম পাত্তা না দিয়ে তারা তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্মাণ করেছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে (অহিংস-সশস্ত্র সংগ্রাম উভয় ধারাতেই) সবচেয়ে বেশি অংশ নিয়েছিল হিন্দু সমাজের মানুষেরা। সবচাইতে বেশি রক্ত হিন্দুরাই দিয়েছিল। যেখানে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষদের অবদান নগণ্য অথচ তারা তাদের প্রার্থীত পাকিস্তান পেয়ে গেল। হিন্দু সমাজ খণ্ডিত ভূখণ্ড পেল— সৌজন্যে কংগ্রেস আর কমিউনিস্ট পার্টি। বিহার বিধানসভার নির্বাচনেও আমরা দেখলাম সেই কংগ্রেস-কমিউনিস্ট ঐক্যবোধ যা লালুপ্রসাদ- নীতিশকুমারের জাতপাত ভিত্তিক রাজনীতির ভাবধারার অশুভ সংমিশ্রণে পুষ্ট হয়ে উঠেছে।

বিহার বিধানসভার নির্বাচন নিয়ে বাংলার মিডিয়াকুল তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীদের মঞ্চে জড়ো করে হিন্দুত্বের পরাজয় বলে সোল্লাসে গলা ফাটাচ্ছে, অথচ বিহারে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে যেভাবে মুসলমান ভোট মেরুকরণ হয়েছে শুধুমাত্র মুসলমান ভোটার হিসেবে, ভারতবাসী বা বিহারবাসী হিসেবে নয়। তার বিপজ্জনক দিকটা এরা তুলেও ধরলেন না। যারা ধর্মনিরপেক্ষ তারা মানুষের জন্য মানুষ হিসেবে গলা ফাটালেই ভালো হোত, শুধুমাত্র বহুত্ববাদের কথা বলে ইসলাম প্রীতির কথা সোচ্চারে ব্যক্ত না করলেই ভালো করতেন। তাতে অন্তত দেশের একটা বিশেষ শ্রেণীর মানুষদের অকারণে অতি তোল্লাই দিয়ে মাথায় তুলে নাচানাচি করার দৃশ্য আমাদের দেখতে হোত না এবং আমরাও নিজেদের বিপন্ন বলে মনে করতাম না। বিহারের ভোটারদের মোটামুটি ৫টি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়--- যাদব, কুর্মি, দলিত, মুসলমান ও বর্ণহিন্দু। মুসলমান ভোট পুরোটাই লালুপ্রসাদ-নীতিশকুমার-সোনিয়া গান্ধীর ভাগে পড়েছে। যাদব, কুর্মি ভোটের অধিকাংশ ভোটও তাই। শুধু দলিত ও বর্ণ হিন্দু ভোট ভাগাভাগি হয়েছে উভয় শিবিরের মধ্যে যার নিট্ ফল লালুপ্রসাদ-নীতিশকুমার-সোনিয়া গান্ধীর সুবিধাবাদী জোটের জয়, যেটা মুসলমান বিচ্ছিন্নতাবাদকে উৎসাহিত করবে।

আমাদের দেশে গণতন্ত্র সেভাবে কোনোদিন ছিল কি? যদি থাকতো তবে নেহরু-গান্ধী পরিবারের পারিবারিক শাসন কয়েক দশক ধরে বজায় থাকতো না। লালুপ্রসাদ যাদবের রাজনীতি মূলত যাদব ভোটভিত্তিক আর নীতিশকুমারের রাজনীতি মূলত কুর্মি সম্প্রদায় ভোটভিত্তিক। এই দুটো

দলেরই ভোটব্যাঙ্ক আবার একই সঙ্গে মুসলমান ভোটারদের ওপর নির্ভরশীল এবং দুটো দলই মুসলমান কার্ড ব্যবহার করে নির্লজ্জভাবে, যেটা আবার কংগ্রেস দলের চির অভ্যস্ত রাজনীতির সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। এই মহাজোট আসলে এক সুবিধাবাদী জোট যারা রাজ্যসভায় অনেক প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক বিল পাশ করাতে দেয়নি, যার অন্যতম সঙ্গী তৃণমূল কংগ্রেস দল যারা সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারা এবং একনায়কতান্ত্রিক ভাবধারার মিশেলে চলে।

ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব অতি সম্প্রতি বলেছেন আর এস এস এবং ইসলামিক স্টেট (আই এস বা আইসিস) সমগোত্রীয়। আমাদের প্রশ্ন, আর এস এস সারাদেশ জুড়ে যে গঠনমূলক কাজ করে কোনো মুসলমান সংগঠন কি সেটা করে? করে না। আই এস গোষ্ঠী পৃথিবী জুড়ে যে নৃশংস গণহত্যা করে চলেছে আর এস এস তা কোনোদিন করেছে কি? করেনি। তাহলে এই বিদগ্ধ ঐতিহাসিক (যিনি নেহরু এবং একই সঙ্গে কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন) এই ধরনের মন্তব্য করেন কোন যুক্তিতে? আসলে আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতারা জানেন মুসলমান সম্প্রদায় সাধারণত গোষ্ঠীগত ভাবে ভোট দিয়ে থাকে, কারণ তারা তাদের মূল পরিচয় একমাত্র মুসলমান হিসেবে দিতেই অভ্যস্ত। কিন্তু ভারতীয় বা বাঙালি-বিহারি-ওড়িয়া-অসমীয়া ইত্যাদি প্রাদেশিক পরিচয়ের ধার ধারে না। সুতরাং বিজেপি ক্ষমতায় এসে ইসলাম বিপন্ন হবে এই স্লোগানটা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় খুব সহজেই খেয়ে যায়, বিশেষ করে মুসলমান সম্প্রদায়ের অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানরা। বিহার বিধানসভার নির্বাচন সেই ইঙ্গিতটাই দিল যেটা সমগ্র ভারতবর্ষের সামনে এক অশনি সঙ্কেত।

কেন তৃণমূল কংগ্রেসের বুদ্ধিজীবী কবি সুবোধ সরকার ও সিপিএমের বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য একসঙ্গে বসে গোমাংস ভক্ষণ করেন? যদি এইটাই ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচায়ক হয়ে থাকে তাহলে কেন তৃণমূল কংগ্রেসের ফিরহাদ ববি হাকিম, সিপিএমের মহম্মদ সেলিম বা কংগ্রেসের আবদুল মান্নান শুয়োরের মাংস খেয়ে নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচয় দেন না? এইসব তথাকথিত বুদ্ধিজীবীর দল বিহারের লালু-নীতিশ-সোনিয়া মহাজোটের সমর্থনে বিবৃতি দিয়ে চলেছেন।

একটা রাজ্যের বিধানসভা ভোটের ফল শুধু সেই রাজ্যের জনগণের মানসিকতার পরিচয় বহন করে না, বহন করে সেই রাজ্যের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিচয়ও, যার অনেকটাই সেই রাজ্যের ক্ষমতাসীন ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মতাদর্শগত আচরণ নিয়ন্ত্রিত এবং আজকের যুগে সংবাদমাধ্যমকে কোন দল কতটা ব্যবহার করতে পারে তার ওপর অনেকটা নির্ভর করে রাজনৈতিক ভারসাম্য। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় কোনো প্রদেশই স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না, কারণ তাকে কেন্দ্রের ওপর অনেকটা নির্ভর করতে হয় এবং কেন্দ্র যদি কোনো বিশেষ প্রদেশকে বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ দেয় তবুও সেই প্রদেশের সব মানুষের মন জয় করা যায় না যদি না সেই প্রাদেশিক সরকার প্রাপ্ত অর্থের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে রাজ্যবাসীর সমস্যার সমাধান না করে ভিন্ন দল পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর দোষ চাপিয়ে দেয়। বিহারে সেটাই ঘটেছে। কারণ কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বিহারকে বিশেষ প্যাকেজ দেওয়া সত্ত্বেও তার যথাযথ ব্যবহার হয়নি এবং কিছু অবাঞ্ছিত ঘটনার দায় (যা বিজেপি শাসিত রাজ্যে ঘটেনি) অকারণে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চেপে বসেছে। আমাদের দেশের তথাকথিত সেকুলার মিডিয়ার কল্যাণে সেটা বিহারবাসীদের একটা বড় অংশের কাছে এমনভাবে প্রচারিত হয়েছে যে গোটা মুসলমান সম্প্রদায় এককাট্টা হয়ে নীতিশ-লালু-সোনিয়া শিবিরের কাছে নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছে।

স্বাধীনতার পর ৬৮ বছর পেরিয়ে যাবার পরেও আমাদের দেশে একটা চরম অমানবিক, অনৈতিক ও অবৈজ্ঞানিক প্রথা চলমান যার নাম বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংরক্ষণ প্রথা। যেটা স্বাধীনতার পরে ২০ বছর পর্যন্ত দরকার ছিল অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য। এমনকী ড. বি আর আম্বেদকরও অনন্তকাল ধরে সংরক্ষণের কথা বলেননি, অথচ শুধুমাত্র ভোটের জন্যই সাতটা দশক ধরে শিক্ষা-চাকরি সব ক্ষেত্রেই সংরক্ষণ প্রথা চলমান। অসংখ্য তফশিলি পরিবার রয়েছে যারা আর্থিক দিক থেকে বিত্তবান বা অতি-বিত্তবান (এমনকী এসটি এবং ওবিসিদের মধ্যেও অনেক বিত্তবান পরিবার রয়েছে)। আবার বর্ণহিন্দু (ব্রাহ্মণ-কায়স্থ) অনেক পরিবার রয়েছেন যারা আর্থিক দিক থেকে নিম্নবিত্ত বা প্রায়-বিত্তহীন। এই একপেশে ও ভ্রান্ত সংরক্ষণ প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন আর এস এসের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। সুবিধেবাদী অ-জাতীয়তাবাদী মুসলমান তোষণকারী রাজনৈতিক দলগুলো সেই সুযোগটাই নিয়েছে, যারা জাতপাতের রাজনীতিটাও একই সঙ্গে করে থাকে।

একদল বুদ্ধিজীবী তাদের সাম্মানিক জাতীয় পুরস্কার ফিরিয়ে দিচ্ছেন। কারণ বিজেপি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে দেশে নাকি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ বিপন্ন। দাদরি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে উত্তরপ্রদেশে। যেখানে মুলায়ম সিং যাদবের দল ক্ষমতাসীন আর কালবর্গী হত্যাকাণ্ড যেখানে ঘটেছে সেখানে সোনিয়ার দল কংগ্রেস ক্ষমতাসীন। তাহলে বিজেপিকে দায়ী করা হচ্ছে কেন? কাশ্মীরে হিন্দু পণ্ডিত সর্বানন্দ প্রেমী ও তাঁর ছেলেকে মুসলমান উগ্রবাদীরা চোখ খুবলে নিয়ে হত্যা করেছিল। দাদরি গ্রামের পাশের কুঁপগাও গ্রামে একটি হিন্দু পরিবারের গোরু পাশের মুসলমান পাড়ার একটি বাড়িতে ঢুকে পড়ায় মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা নির্বিচারে গুলি চালানোয় ১৮ বছরের কিশোর সঞ্জু রাঠোর মারা যায় এবং একাধিক হিন্দু গুরুতর আহত হয়। এটি দাদরি কাণ্ডের অল্প কয়েকদিন আগেই ঘটেছিল। মজফ্‌ফরপুর দাঙ্গায় ৬২ জন মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল। ওই সময়ে ওই সব রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় ছিল না। আমাদের প্রশ্ন, তখন কেন এই সব বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের পুরস্কার ফেরত দেননি? এটা মুসলমান তোষণ ছাড়া আর কী? ■

# নেপাল : হিমালয়বক্ষে ভারতের দ্বারপাল অধুনা কি বিপথগামী ?

অম্লানকুসুম ঘোষ

যে কোনো দেশের বিদেশনীতি সাফল্য লাভ করে প্রথমত, তার প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে নিরাপদ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে। ভারত-ও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু নিয়তির অভিশাপের মতো ভারতের অন্যতম প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান ও চীন ভারতের চিরশত্রু। তাই নেপাল, ভুটান ইতাদি শান্তিপ্রিয় দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে ভারত নিজ প্রতিবেশী দেশসমূহের মধ্যে বিদেশনীতির ভারসাম্য বজায় রাখতো। এদের মধ্যে ভুটানের সঙ্গে ভারতের মিত্রতা-সম্পর্ক এখনো বজায় আছে কিন্তু নেপালের সঙ্গে মিত্রতায় এখন ভাটার টান। কার্যকারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আগে খতিয়ে দেখা যাক অতীত থেকে বর্তমান ভারত-নেপাল সম্পর্ক কীরূপ ছিল।

নেপালের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক সুপ্রাচীনকালের। আড়াই হাজার বছর আগে কপিলাবস্তুর শাক্যবংশের সময় থেকে নেপালের যে রাজনৈতিক ইতিহাস পাওয়া যায় তা ভারতের থেকে অভিন্ন নয়। বস্তুত তখন ভারত ও নেপাল একই দেশ অখণ্ড ভারতবর্ষের অংশ ছিল। শাক্যবংশ ভারতের অন্যতম সম্মাননীয় রাজবংশ হিসেবে পরিগণিত ছিল। শাক্যবংশের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য রাজবংশের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হোত। আর শাক্যসিংহ তার প্রবল পরাক্রমে যখন 'মার ও মারি'-কে পরাভূত করে সমগ্র জগৎ-কে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর হাত থেকে মুক্ত করে করুণা-সাগরে নিমজ্জিত করে মুক্তির পথ-নির্দেশ করেছেন তখন শুধুমাত্র শাক্যবংশ-শাসিত কপিলাবস্তু- কেন্দ্রিক নেপাল নয়, বরং সমগ্র ভারতবর্ষই ছিল তাঁর লীলাভূমি এবং তৎকালীন মগধ ছিল তার ভিত্তিভূমি। পরবর্তীকালেও এই সংহতি অটুট ছিল। ইতিমধ্যে নেপালের শাসক বদলেছে বারংবার। নেপালের সর্বশেষ ও অধুনা পর্যন্ত সর্বাধিক বিখ্যাত শাসক-সম্প্রদায় গুর্খারা পর্যন্ত ইতিহাসের অলঙ্ঘ্য নিয়মে ভারতেরই সন্তান। আলাউদ্দিন খিলজির আক্রমণে মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রতীক মেবার ও তার রাজধানী চিতোরের পতনের পর অবশিষ্ট রাজপুত সৈন্যদের একাংশ নেপালে পলায়ন করে। তারাই পরে সেখানকার শাসনক্ষমতা দখল করে এবং গুর্খা নামে পরিচিত হয়। চিতোরের মতো গুর্খারাও তাদের রাজাকে রাণা বলে। গুর্খা রানারা বরাবর ভারতের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক বজায় রেখেছে। যুদ্ধপ্রিয় এই জাতি ভারতের প্রতি সৌভ্রাতৃত্ববশত কোনোদিন ভারত আক্রমণ করেনি, বরং তাদের সামরিক শক্তির বলে ভীত হয়ে চীন বা তথাকার অন্য কোনো মঙ্গোলয়েড জাতি কোনোদিন নেপালের পথে ভারত আক্রমণের ঝুঁকি নেয়নি। ফলস্বরূপ হিন্দুকুশ পর্বতের খাইবার পাস দিয়ে যেমন ভারত বারংবার বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করেছিল, হিমালয়ের পূর্বপ্রান্তের না-থু-লা (যদিও তা এখন সিকিমের অন্তর্গত) বা অন্য কোনো গিরিপথ দিয়ে সেরকম কোনো আক্রমণ-ঝঞ্ঝা ভারতের অভিমুখে ধেয়ে আসতে পারেনি। সমকালীন চীনের বুকে যে মঙ্গোল আক্রমণের তাণ্ডব চলেছিল তার সামান্যতম আভাস-ও যদি ভারতের ওপর পড়তো তাহলে ভারতের ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় হয়তো নাও অটুট থাকতে পারতো। সেদিক দিয়ে বিচার করলে বলা যায় যে নেপাল হিমালয়ের বুকে ভারতের দ্বারপাল হিসেবে তার মহান ভূমিকা পালন করেছে দীর্ঘকাল ধরে। মহাবিদ্রোহ ও অন্য নানা সময়ের অহেতুক বৃটিশশক্তি ছাড়া ইতিহাসের অন্য কোনো অধ্যায়ে তাদের আচরণ কখনও ভারতের স্বার্থের প্রতিকূল হয়নি। স্বাধীনতার পরেও ভারত-নেপাল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক

চীনের উস্কানিতে ভারতের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রথম নেপাল সফরে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কৈরালা।

আন্তর্জাতিক কূটনীতির উত্থান-পতন নির্বিশেষে থেকেছে কুসুমাস্তীর্ণ। ভারত ছাড়া অন্য কোনো দেশের সঙ্গে নেপাল দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক তৈরি করেনি। ভারত ভারতীয় মুদ্রায় নেপালের থেকে আমদানিকৃত জিনিসের দাম মেটালেও নেপালে রপ্তানিকৃত বস্তুর দাম নিয়েছে মার্কিন ডলারে, তবু নেপাল একবারের জন্যও চীনের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করেনি, ভারতের প্রতি অখণ্ড আনুগত্য বজায় রেখেছিল এযাবৎকাল পর্যন্ত।

কিন্তু অতীত সম্পর্ক এত মধুর হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে এই দুই দেশের সম্পর্ক একেবারে তলানিতে। বর্তমানে নেপাল চীনের সঙ্গে দৃঢ় বাণিজ্য সম্পর্কে আবদ্ধ। নেপালের বর্তমান বিদেশনীতি কাঠমাণ্ডু থেকে নয় চীন থেকে নির্ধারিত হয়, চীনের সঙ্গে এমনকী সামরিক সম্পর্ক স্থাপনেও নেপাল আজ অনাগ্রহী নয়। অপরপক্ষে ভারতের সঙ্গে নেপালের বর্তমানে কোনো বাণিজ্য সম্পর্ক প্রায় নেই বললেই চলে। ভারতের যে কোনো পদক্ষেপকে তারা আগ্রাসন বলে অভিহিত করছে। ভারতের সঙ্গে কোনোরূপ বৈদেশিক বা সামরিক সম্পর্ক স্থাপন করা এখন তাদের কাছে আকাশকুসুম কল্পনারই নামান্তর। শুধু তাই নয়, সম্প্রতি নেপালের বুকে হওয়া ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের পর ভারতের নিঃস্বার্থ ও বিপুল সাহায্যের পরও তারা ভারতকে তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপকারী বলে বর্ণনা করেছে। বিরোধিতার সর্বশেষ উদাহরণ হলো নেপালের সাম্প্রতিক সংবিধান। এই সংবিধানে নেপালে বসবাসকারী মূলত কৃষিজীবী মদেশিয়া সম্প্রদায়ের লোকেদের কোনো নাগরিক অধিকার দেওয়া হয়নি। আর তার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে তারা ভারতীয় বংশোদ্ভূত। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, চীন থেকে আমদানিকৃত মাওবাদের ভ্রান্ত ধারণায় আচ্ছন্ন বর্তমান নেপালের বকলমের শাসকগোষ্ঠী গুর্খারা নিজেরাও ভারতীয়। ভিন্ন সময়ে নেপালে পদার্পণ করা দুই ভারতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে হয়ে চলা এই ভ্রাতৃদ্বেষী সংঘাতের সময় শ্বাপদের লোলুপতা নিয়ে পাশেই উপস্থিত কূটনীতি জগতের আগ্রাসী খেলোয়াড় চীন। অতীতের তিব্বতের মতো আজকের নেপালকেও নিজের লোলুপ করাল দ্রংষ্ট্রার মধ্যে গ্রাস করাই তার লক্ষ্য।

আর চীন তার অভীষ্ট অসদুদ্দেশে কতটা সফল এবং তার প্রভাব ভারতের পক্ষে কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে তা বুঝতে একটু বিশ্লেষণ করা যাক। বর্তমান পুঁজিনিবিড় অর্থনীতিতে পুঁজিহীন নেপাল এবং বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর রণনীতির যুগে প্রযুক্তিতে পশ্চাদপদ নেপালকে আপাতদৃষ্টিতে গুরুত্বহীন বলে মনে হতে পারে, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে বাস্তব অন্যরূপ। বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ নেপাল নিজে শিল্পে অনুন্নত হলেও যে কোনো শিল্পে বিকাশশীল দেশের শিল্পে বিপুল পরিমাণ কাঁচামাল জোগান দিয়ে সে দেশীয় শিল্পের বিকাশসাধনে অনন্য ভূমিকা নিতে পারে। শিল্পে বিকাশশীল দেশ হিসেবে সেই বনজ সম্পদের ভাণ্ডার-কে কে কাজে লাগাতে পারে ভারত না চীন তাই এখন আর্থ-কূটনীতির মঞ্চে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর কী হয় তার ওপর ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে অনেকটাই। নেপালের জলসম্পদ ভারত ও চীন দুই দেশের পক্ষেই ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। নেপালের অন্তর্গত হিমালয়ের অংশে উৎপন্ন প্রচুর বরফগলা নদী (এইসব নদীতে সারাবছর অর্থাৎ খরা ও বর্ষা উভয় মরসুমেই জল থাকে) ভারতের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। তিব্বতে উৎপন্ন নদীগুলির মতো এই নদীগুলিরও উৎস এবং সেই সূত্রে গতিপথ যদি চীনের নিয়ন্ত্রণে আসে তাহলে ভারতের কৃষি ও শিল্পই শুধু বিপন্ন হবে না পানীয় জলের অভাবে ভবিষ্যতে বিপন্ন হতে

পারে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যও। বিশেষ করে বিশ্ব-উষ্ণায়নের চোখরাঙ্গানির এই যুগে যখন সব বিজ্ঞানীরা বলছেন যে বর্তমান পৃথিবী যদি তেলের হয় তাহলে ভবিষ্যৎ পৃথিবী হবে পানীয় জলের, তখন নেপালের মতো পানীয় জলের এই বিশাল ভাণ্ডার ভারতের হাতছাড়া হওয়ার পরিণতি যে কী ভয়ঙ্কর হতে পারে তা কারোরই অগোচর নয়। মাউন্ট এভারেস্ট-সহ হিমালয়ের অনেকগুলি সুউচ্চ শৃঙ্গ নেপালের প্রতি গোটা বিশ্বের অভিযাত্রী ও পর্যটকের আকর্ষণ বাড়িয়েছে। আবার কপিলাবস্তু-সহ বেশ কিছু জায়গা তাদের ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক আকর্ষণে সারা পৃথিবীর পর্যটকদের প্রতি বছর টেনে আনে নেপালের দিকে। প্রতিবেশী ও মিত্র দেশ হিসেবে ভারত এই বিপুল পর্যটনের এক অংশের ভাগীদার হোত বাজারের নিয়ম মেনেই। নেপালের বন্ধুত্ব হারালে পর্যটনের বিকাশের এই সুযোগও হাতছাড়া হবে ভারতের। পরিষেবা-ক্ষেত্রের বৃদ্ধিতে রীতিমতো লম্ফপ্রদানকারী দেশ ভারতের পক্ষে পর্যটনের মতো এক বিরাট পরিষেবা-ক্ষেত্রে বিকাশের এতবড় সুযোগ হাতছাড়া করা যে কত বড় ক্ষতি তা অর্থনীতি-শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন।

উন্নত যুদ্ধাস্ত্রের অভাবে নেপাল নিজে সামরিক-ক্ষেত্রে দুর্বল হলেও নেপালের অধিবাসীরা (বিশেষত গুর্খারা) যুদ্ধে (বিশেষত পাহাড়ি যুদ্ধে) খুব-ই উন্নত। নিজেদের দেশে সেই যুদ্ধবিদ্যা প্রয়োগের ক্ষেত্র খুব-ই সীমিত হওয়ায় এবং বিকল্প পেশা তেমন কিছু না থাকায় তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভারতীয় সেনাবাহিনীতে নাম লেখাতো। ৬২-র নেফা থেকে ৯৯-র কারগিল অনেক যুদ্ধেই নিজেদের দক্ষতার নিদর্শন তারা রেখেছে। এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তারা যদি নিজেদের যাবতীয় দক্ষতা-সহ আনুগত্য বদলায় তাহলে ভবিষ্যতের যে কোনো পাহাড়ি যুদ্ধে (বিশেষত সে যুদ্ধ যদি চীনের সঙ্গে হয়) ভারতের অবস্থা অনেকটাই শোচনীয় হবে।

মনে প্রশ্ন জাগে, এককালের সেই আত্মনিবেদিত মহান বন্ধু কোন মন্ত্রবলে আজকের এই চরম শত্রুতে পরিণত হলো? আগ্রাসী চীনের সম্প্রসারণশীল পদক্ষেপসমূহ তো আছেই, কিন্তু শুধু তাকে দোষ দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকলেই হবে না; নিজেদের দোষ সম্বন্ধেও সচেতন হতে হবে। শুধুমাত্র সমালোচনায় ব্যস্ত থাকলে প্রকৃত সত্য উন্মোচিত হবে না, তার জন্য আত্মসমালোচনারও প্রয়োজন। ভারত সরকারের আত্মঘাতী বিদেশনীতিই বাধ্য করেছে নেপালকে আজকের অবস্থানে পৌঁছতে। ২০০৫ সাল থেকে নেপালে যে ভয়ঙ্কর রাজদ্রোহী আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার পেছনে কিছু বাস্তব কারণ থাকলেও আন্দোলন তীব্রতর হয়েছিল মূলত চীনের পঞ্চমবাহিনী হিসেবে কাজ করা নেপালের মাওবাদীদের তৎপরতায়। তার সঙ্গে চীন তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল আন্তর্জাতিক কুটনীতির মঞ্চে নেপালকে একঘরে করতে। ঘরে-বাইরে এই দ্বিমুখী আক্রমণের মুখে পড়ে অসহায় নেপাল তখন ঘাড়ের কাছে অগ্নি-নিঃশ্বাস ফেলা চীনা ড্রাগনকে ঠেকাতে দ্বারস্থ হয়েছিল চিরদিনের বন্ধু ভারতের। কারণ দক্ষিণ এশীয় কূটনীতিতে একমাত্র ভারতেরই ক্ষমতা ছিল চীনা ড্রাগনের লম্ফঝম্ফকে নিজের হস্তীসম উপস্থিতির দ্বারা স্তব্ধ করে দেওয়ার। চির-অনুগত নেপাল ভারতের কাছ থেকে এইটুকু কৃপা দাবি করতেই পারতো তখন অবধি। কিন্তু তৎকালীন ভারত সরকার এক অদ্ভুত নীরবতার সঙ্গে নেপালকে উপেক্ষা করে গেল দীর্ঘ আট বছর ধরে। স্থানীয় কূটনীতির ময়দানে চীনের বিশাল শক্তির সঙ্গে এবং দেশের ভেতর ঘরশত্রু মাওবাদীদের সঙ্গে আর পেরে না উঠে নেপাল রাজশক্তি আত্মসমর্পণ করল। রাজতন্ত্রের পতন হলো বলে তৎকালীন ভারত সরকার অভিনন্দন জানালো তৎকালীন নেপালের সংগ্রামকারীদের অর্থাৎ মাওবাদীদের। পৃথিবীর কূটনীতির ইতিহাসে এর কোনো নজির নেই। নিজেদের বন্ধু সরকারের পতনে এতখানি উল্লাস মনে হয় নেহরু যুগের আত্মঘাতী বিদেশনীতির অন্ধ অনুসরণকারীর পক্ষেই করা সম্ভব। ২০১৩-র সেই অশুভক্ষণ থেকেই নেপালে চলছে প্রচণ্ডর (পুষ্পকুমার দহল) নেতৃত্বাধীন মাওবাদীদের বকলমে চীনের শাসন।

কিন্তু সমস্যা যত জটিল হোক তার সমাধান তো নিশ্চয়ই আছে। কূটনৈতিক সমস্যার সমাধানও কূটনৈতিক পথেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তার বিদেশনীতির অশ্বমেধ ঘোড়া ছুটিয়েছেন জাপান থেকে আমেরিকা। সর্বত্রই জয় তার করায়ত্ত হলেও তাঁর প্রথম বিদেশ সফরের দেশ অধুনা বিপথগামী। নেপালের মানুষের মন জয় করে তাদেরকে পুনরায় ভারত-বন্ধুতে পরিণত করতে না পারলে তার বিদেশ জয়ের তরী পারাবার পার হয়ে গোষ্পদে ডুবে যাবে, আর তার বিষময় ফলাফল শুধুমাত্র বিদেশনীতির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে না।

*With Best Compliments from -*

**RAMAA ENGINEERING**

**Engineers & Contractors**

# নেপালকে অশান্ত করতে কৌশলী চাল চীনের, শান্তি রক্ষায় পাল্টা ভারতেরও

**অভিমন্যু গুহ**

ঘটনার বীজ বোনা হয়েছিল ২০ সেপ্টেম্বরই। যেদিন নেপাল তার প্রথম গণতান্ত্রিক সংবিধান গ্রহণ করেছিল। এর আগের দিনই ভারতের বিদেশসচিব এস. জয়শঙ্কর 'পূর্ণ সর্বসম্মতি'র বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন যে এই সংবিধান প্রকাশিত কিংবা কার্যকরী করার আগে দেখে নেওয়া উচিত, কেননা মদেশি-রা কিন্তু বোর্ডে নেই। বিষয়টি একান্তভাবেই নেপালের অভ্যন্তরীণ বিষয় কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সেদেশের গণ্ডগোলের আঁচ ভারতে পড়া অবশ্যম্ভাবী। এও অনস্বীকার্য যে নেপালে উত্তরোত্তর চীনের প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা ভারতের পক্ষে রীতিমতো উদ্বেগজনক। সুতরাং নেপালের যে কোনো অশান্তিকে ভারত যে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে নজরে রাখবে এটা স্বাভাবিক। ২২ সেপ্টেম্বরই তরাইয়ে হিংসার ঘটনা নিয়ে ভারত গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। ভারতের বক্তব্য ছিল--- এই ঘটনা নেপালকে 'ক্রমাগত সতর্ক' করছে যাতে তারা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে উত্তেজনা কমাতে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়। পরিস্থিতি আরও খারাপ দিকে মোড় নেয় গত ২৭ সেপ্টেম্বর। যেদিন নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বাবুরাম ভট্টরাই মদেশিদের 'কথা বলার অধিকার হরণ করা হচ্ছে,' এই অভিযোগ তুলে পদত্যাগ করেন।

ঘটনাপ্রবাহ ভারতের বিপক্ষে গেলেও দেশ তার বিদেশনীতি মেনে অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাতে চায়নি। নেপালে ভারতের রাষ্ট্রদূত রঞ্জিত রাই স্পষ্টই জানান বীরগঞ্জ তো বটেই, এমনকী ভারত-নেপাল সীমান্তের কোথাও ভারত অবরুদ্ধ করেনি। ৪ অক্টোবর নেপালি ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত নেয় তারা প্রস্তাবে সংশোধন এনে প্রতিবাদকারীদের দুটি দাবি মেনে নেবে এবং মদেশিদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি নিশ্চিত করবে। ৯ অক্টোবর ভারত স্পষ্ট করে যে নেপালিদের একাংশই ভারত-নেপাল সীমান্ত অবরুদ্ধ করেছে এবং যার ফলে নেপালে জ্বালানি সমস্যা দেখা দিচ্ছে। ১৬ অক্টোবর দশেরার দিন নেপালের নব-নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি বলেন, অবরোধ সমস্যার সমাধানে তিনি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী এবং উপপ্রধানমন্ত্রী কমল থাপা এনিয়ে শীঘ্রই ভারত সফরে যাবেন। কিন্তু এই পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল ২ নভেম্বর। যেদিন নেপালে হিংসার বলি হলেন এক ভারতীয়। ঘটনাটি ভারতের পক্ষে এতই উদ্বেগজনক ছিল যে সোচ্চার হতে হলো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও। তিনি ঘটনার তদন্তের দাবি জানালেন। নেপালের প্রধানমন্ত্রী সরাসরি আঙুল তুলে দিলেন ভারতের দিকে যে ভারত নাকি নেপালের মদেশিকেন্দ্রিক রাজনৈতিক দলগুলিকে উস্কানি দিচ্ছে। তাঁর এহেন মন্তব্যে চীনের প্রভাব কতদূর কাজ করেছে তা খতিয়ে দেখতে চাইছেন কূটনীতিজ্ঞরা। তাঁরা মনে করেন পৃথিবীতে একমাত্র হিন্দুরাষ্ট্র থাকা নেপালকে ভারত তার অভিভাবক-সুলভ কর্তব্যে বহুদিন রক্ষা করেছে। কিন্তু সেদেশে যেদিন থেকে চীনের মদতে মাওবাদী প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে সেদিন থেকেই ভারতের সঙ্গে সুকৌশলে দূরত্ব তৈরির চেষ্টা হয়।

সাংবিধানিক অধিকারের জন্য মদেশিদের আন্দোলন।

মদেশি জনঅধিকার ফোরামের চেয়ারম্যান উপেন্দ্র যাদব যেমন স্পষ্টই বলেছেন--- এটা নির্বোধের কথা যে অবরোধের পিছনে ভারত আছে। আমরাই সীমান্ত অবরোধ করেছি। মানুষ লড়ছেন। এর মধ্যে কোন দেশ এল গেল তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। অন্যদিকে নেপাল সদ্‌ভাবনা পার্টির প্রেসিডেন্ট রাজেন্দ্র মাহাতো বলেছেন, এই প্রতিবাদ থামবে না। আমরা এই আন্দোলনকে আরও

উচ্চতর সৈদ্ধান্তিক স্তরে নিয়ে যাব। আমরা যা চাইছি, যতক্ষণ তা না পাচ্ছি, ততদিন এই আন্দোলন চলবেই। এখন দেখে নেওয়া যাক এই আন্দোলনের মূল হোতা মদেশিদের দাবিটা ঠিক কীরকম। প্রথম দাবি, জনসংখ্যার ভিত্তিতে সদর্থক পদক্ষেপ নিতে হবে। অর্থাৎ মদেশিদের উচ্চতর সরকারি চাকরিতে কাজ পাওয়া, সেইসঙ্গে আমলাতন্ত্র এবং পুলিসেও মদেশিদের চাকরি নিশ্চিত করতে হবে তাদের জনসংখ্যার ওপর ভিত্তি করে। এঁদের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দাবি রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে জনসংখ্যাকে কেন্দ্র করে, ভূগোলকে কেন্দ্র করে নয়। এঁরা চাইছেন বর্তমানে নেপালের সংসদের নিম্নকক্ষে ২৭৫ জন সদস্যের মধ্যে যে ৬০-৬৫ জন সদস্য তরাই অঞ্চল থেকে নির্বাচিত হন, সেখানে এই সংখ্যাটা আরও অন্তত ২০ বাড়ুক। অর্থাৎ মদেশি অধ্যুষিত তরাই একটি ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল। কিন্তু জনসংখ্যার পরিবর্তে ভৌগোলিক সীমানাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য কমবসতিপূর্ণ অঞ্চলও যে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পায়, ঘন-বসতির অঞ্চলও তার ব্যতিক্রম হয় না। ফলে জনসংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি ক্রমশ লঘু হয়ে যাচ্ছে। এই ব্যবস্থা পরিবর্তনের দাবি তুলেছেন মদেশিরা।

এঁদের তৃতীয় দাবি মদেশি জনসংখ্যাকে প্রতিফলিত করতে গেলে তরাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রদেশগুলিকে পুনর্গঠিত করতে হবে। আর চতুর্থ দাবিটি হলো মদেশি ও বিহারের মিথিলাঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে 'রোটি-বেটি' সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করতে হবে। একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে ভারত-নেপালের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বহু প্রাচীন। বিশেষ করে দু'দেশের ধর্মীয় বুনিয়াদ ভারত-নেপালকে আত্মার-আত্মীয় করে তুলেছিল। বিশেষ করে দক্ষিণ এশীয় যে সংস্কৃতির কথা ইদানীং খুব আলোচিত হচ্ছে যা মূলত সেকালের হিন্দুস্থানেরই সংস্কৃতি তার অংশীদার বর্তমানের ভারত-নেপাল উভয় দেশই। যেমন, ভগবান বুদ্ধের কথাই ধরা যাক, তাঁর জন্ম বর্তমানের নেপালে। তাঁর পাদস্পর্শ অবশ্য শুধু দক্ষিণ এশিয়াকেই ধন্য করেনি। গোটা বিশ্বই তাতে ধন্য হয়েছিল। সীতাদেবীও ছিলেন নেপালেরই কন্যা, পুরুষোত্তম রামচন্দ্রকে বিবাহের পর অযোধ্যার রাণী হয়েছিলেন। সেই পুরাণ ইতিহাসের যুগ থেকে আজকের আধুনিক বিশ্ব— নেপালের সঙ্গে ভারতের সাধারণ অধিবাসীদের সংযোগ ক্রমশই নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয়েছে। যেমন ভারতে চারধাম যাত্রা থেকে শুরু করে এদেশের অসংখ্য তীর্থস্থান— হরিদ্বার, হৃষীকেশ, বারাণসী, বৈষ্ণোদেবী ইত্যাদি জায়গায় নেপালি পুণ্যার্থীদের যেমন অবাধ গতিবিধি তেমনি সেদেশের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে অবস্থিত পশুপতিনাথ, লুম্বিনী (ভগবান বুদ্ধের জন্মস্থান), জনকপুরে অবস্থিত রাম-জানকী মন্দির (জনক ও তাঁর কন্যা সীতাদেবীর জন্মস্থান) ভারতবর্ষের মানুষজনেরও পরম পবিত্র স্থান ও তাঁরা সেখানে যানও। বলাই বাহুল্য, এই দুই দেশের সাধারণ মানুষের এই যে সাংস্কৃতিক অবিচ্ছিন্নতা কোনো রাষ্ট্রনীতিরই ক্ষমতা ছিল না তাকে প্রভাবিত করে। ভারতকে চাপে রাখতে চীনের অনেকদিনই 'টার্গেট'-এর তালিকায় নেপাল ছিল। তাই সেদেশকে অশান্ত করার স্বার্থই ছিল ভারতকে ব্যতিব্যস্ত করা। হিন্দুরাষ্ট্র নেপালকে হিন্দুত্বের বা আরও ভালোভাবে বললে হিন্দুয়ানির পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিলে ভারত-নেপালের সাংস্কৃতিক যোগ যে ছিন্ন হবে চীনের লক্ষ্য সেদিকে ছিল বলেই সেদেশের মাওবাদীদের মাধ্যমে তারা সে পথে গিয়েছিল। মনে রাখা দরকার নেপালে যে তেল আমদানি হয় তার সবটুকুই কিন্তু হয় ভারতের মাধ্যমে। কিন্তু হিমালয়ের মধ্যে দিয়ে যে পথে ভারত থেকে এই তেল রপ্তানী হয় তার সঙ্গে চীনের সংযোগ রয়েছে। গত এপ্রিল থেকেই ভূমিকম্পের দরুণ এই পথ বন্ধ। সুতরাং ভারত নেপাল রপ্তানি আমদানি মূলত প্রাকৃতিক কারণেই সঙ্কটের মুখে। কিন্তু চীন বিষয়টি নিয়ে নোংরা রাজনীতি করে নেপালের মানুষের মধ্যে ভারত-বিরোধী মনোভাব তৈরি করার জঘন্য খেলায় মেতেছে। বিশেষ করে নেপালে অস্থির রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি করতে পারলে আখেরে চীনেরই লাভ এবং এই অস্থিরতার সুযোগে সেদেশের সংবিধান প্রণয়নে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে চীন-পন্থী সংবিধান প্রস্তুতের কথাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এই ভারতবিরোধী মনোভাবকে জোরদার করতে চীন চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখছে না।

২০১৩ সালে চীন নেপালের একটি হাইড্রোপাওয়ার প্রজেক্টে বিনিয়োগ করে ১.৬ বিলিয়ন ডলার। নেপালে সর্বোচ্চ বিদেশি বিনিয়োগ এটাই। চীন তিব্বতে নেপালের সঙ্গে তার সীমান্ত খুলে দিতেও এখন রাজি। 'গুডউইল জেসচার'-এর নামে বেজিং অতি সম্প্রতি ১ হাজার মেট্রিকটন পেট্রোলিয়াম নেপালকে দান করার পাশাপাশি নেপাল চীন জ্বালানি চুক্তিও সম্পাদিত হয়েছে। অবশ্য নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হবার পর ভারতও হাত গুটিয়ে বসে নেই। ২০১৪ সালের আগস্টে প্রধানমন্ত্রী মোদী নেপাল সফরে গিয়েছিলেন। ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত নেপালকে ১ বিলিয়ন ডলার অর্থসাহায্যেরও ঘোষণা করেছেন তিনি। স্মরণ করা প্রয়োজন, যে মদেশিদের আন্দোলন নিয়ে নেপাল আজ এত উত্তাল তাদের সঙ্গে ভারতের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। কারণ ভারতের বৃহত্তর মিথিলা অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন এঁরা। সুতরাং এঁদের প্রতি আমাদের সহমর্মিতা থাকতেই পারে। কিন্তু ভারত এখনও বর্তমান নেপালের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাবে না। কিন্তু এর মানে এই নয় যে চীনের নোংরা রাজনৈতিক খেলার সামনে ভারত নতজানু হয়ে থাকবে। তাই জেনেভাতে আয়োজিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে ভারত প্রথমবার বিষয়টিকে উপস্থাপিত করেছে। নেপালে শান্তি ফেরানোর পাশাপাশি সেদেশে চীনের প্রভাব হ্রাসই ভারতের এখন একমাত্র লক্ষ্য।

## চিঠিপত্র

# মোদী সরকারের শিক্ষানীতি ও তার প্রাসঙ্গিকতা

প্রায় ১৬ মাস অতিক্রান্ত করলো কেন্দ্রের মোদী সরকার। এই ১৬ মাস দেশ দেখলো দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ সরকার যা স্বাধীনতার পরে ভারতে বিরল। তাই সরকারের বিরোধিতা করার কিছু না পেয়ে বিরোধীরা মূলত বামপন্থীরা এখন সরকারের শিক্ষানীতির সমালোচনায় মুখর। জাতীয় রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাওয়া বামেরা একটি পত্রিকার শারদ সংখ্যায় অধিকাংশ পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন আর এস এস ও মোদী সরকারের সমালোচনায়। তারা মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করার প্রচেষ্টা করছেন যার যোগ্য উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন আছে।

আমাদের দেশে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা শিক্ষানীতির ওপর আলোকপাত করা যাক। ভারতবর্ষে ৭০০ বছর মুসলমান শাসন চলেছে। মুসলমান শাসনের সময় বলপূর্বক হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার কথা আমাদের সবার জানা। কিন্তু এত অত্যাচার সহ্য করেও মুসলমান শাসনের শেষ লগ্ন পর্যন্ত ভারতে হিন্দুরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাই বুদ্ধিমান বৃটিশ সরকার তাদের শাসনব্যবস্থার ভিত শক্ত করতে চেয়েছিল হিন্দু সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানতে। মেকলে এমন এক শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন করতে চেয়েছিলেন যাতে হিন্দুরা শুধুমাত্র জাতে হিন্দু থাকে আর সংস্কৃতিতে হয়ে ওঠে ইংরেজ। তাই প্রথম যেটি বলা হলো তা হলো আর্যরা বিদেশি অর্থাৎ মুসলমানদের মতো আর্যরাও বিদেশি যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তারপর বলা হলো হিন্দুধর্মের বর্ণবৈষম্যের কারণে নিম্নবর্গের হিন্দুরা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে। যদি তাই হয় তবে মুসলমান শাসকদের এত হিন্দুমন্দির ধ্বংস করার প্রয়োজন কী ছিল। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার ভারতবর্ষে মুসলমানরা সংখ্যাগুরু হয়েছে মূলত পশ্চিম ভারতে যেখানে বিদেশি আক্রমণ বেশি হয়েছে। বাংলায়ও বেশি, কারণ বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা বেশি ছিল। অহিংস বৌদ্ধদের অত্যাচারের মাধ্যমে সহজেই ধর্মান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া ভারতের বাকি অংশে হিন্দুরাই সংখ্যাগুরু। যদি নিম্নবর্গের হিন্দুরা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করতো তাহলে ভারতবর্ষের সর্বত্র মুসলমান সংখ্যার অনুপাত প্রায় এক থাকতো।

স্বাধীনতার পরে ভারতবর্ষে এক বিশেষ শ্রেণীর উদ্ভব হয় যাদের বলা হয় বামপন্থী বুদ্ধিজীবী। এই বুদ্ধিজীবীদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল হিন্দু সংস্কৃতি। ভারতবর্ষের পাঠ্যসূচি মূলত ইতিহাসের পাঠ্যক্রম রচনায় ওদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। স্বাধীন ভারতে সংস্কৃত চর্চার বিলুপ্তি ঘটে অথচ মাদ্রাসাগুলিতে নিয়মিত চলে আরবি ও ইসলামিক শিক্ষা। ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করেন রোমিলা থাপার, ইরফান হাবিবের মতন ঐতিহাসিক। অথচ তাদের মনস্ক না হওয়ায় বঞ্চিত হন রমেশ চন্দ্র মজুমদার। এই ইতিহাসে হিন্দু রাজাদের স্থান খুব কম হয় অথচ মুসলমান শাসন বড় আকারে স্থান পায়। রচিত হয় মুসলমান শাসকদের গুণগানে ভরা ইতিহাস। বড় আকারে স্থান পায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস। এমনকী স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস রচনার সময়ও সুকৌশলে জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনগুলিকে বড় করে দেখানো হয়, অথচ ইতিহাসে সেভাবে স্থান পায় না চরমপন্থী আন্দোলন। ইতিহাসে ব্রাত্য থেকে যায় হিন্দু মহাসভার ভূমিকা। আর এস এসের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার বা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ভূমিকা। নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের ভূমিকাও সে অর্থে ইতিহাসে স্থান পায় না। এমনকী কিছু বামপন্থী নেতা সুভাষ বোসকে জার্মানির দালাল বলতেও দ্বিধাবোধ করেননি।

১৯৩৯ সালে নেতাজীর নির্দেশে ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী ডাঃ হেডগেওয়ারের সঙ্গে দেখা করেন দেশের স্বাধীনতার জন্যে যা অনেকেরই অজানা।

এমন পরিস্থিতিতে ২০১৪ সালে কেন্দ্রে এমন এক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় যা পুরোপুরি বামপন্থী প্রভাবমুক্ত। ফলে দেশের সঠিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি দেশের মানুষের কাছে তুলে ধরতে উদ্যোগী হয় এই সরকার। এতেই রেগে ওঠে দেশের বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা। এক বিশেষ পত্রিকার পুজো সংখ্যায় এক বিশিষ্ট বামপন্থী ঐতিহাসিক অভিযোগ করেন যে আর এস এস আমাদের জাতীয়তাবাদকে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদে পরিণত করছে, অথচ জাতীয়তাবাদের চরিত্র হওয়া উচিত ধর্মনিরপেক্ষ। আমার প্রশ্ন, হিন্দু সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে এদেশে জাতীয়তাবাদ হয় কি? প্রাচীন ভারতের কোনো উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক নিদর্শন সে অর্থে নেই। সেক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি জানার অন্যতম উপায় হলো আমাদের দু'টি মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতকে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা কি কখনো সাম্প্রদায়িকতা হতে পারে? এছাড়াও গীতায় আমাদের প্রাচীন ধ্যান-ধারণার অনেক নিদর্শন আছে। গীতায় কোথাও বলা হয়নি যে হিন্দু ধর্ম পালন করতে হবে।

এছাড়াও গীতার সমস্ত শ্লোকে আছে 'ভগবান উবাচঃ', 'কৃষ্ণ উবাচঃ' নেই। এই ভগবান বিশ্বের ভগবান। এইরূপ একটি গ্রন্থকে জাতীয় গ্রন্থ বা পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে আপত্তি কোথায়? আর সংস্কৃত থেকে ভারতের সমস্ত ভাষার উৎপত্তি তাই ভারতের ভাষার ইতিহাস জানতে কেন সংস্কৃতের ওপর জোর দেওয়া হবে না।

যে বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে ইংরেজি তুলে বা পাশ ফেল প্রথা তুলে রাজ্যের চরম সর্বনাশ করেছে তাদের বুদ্ধিজীবীদের মুখে মোদী সরকারের শিক্ষানীতির সমালোচনা মানায় না। আর যে সমস্ত বুদ্ধিজীবী হিন্দু জাতীয়তাবোধকে ধর্মীয় জাতীয়তাবোধ বলেন তারা হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতির পার্থক্যটিই বোঝেন না। হিন্দু সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি হয়

না আর হিন্দু সংস্কৃতি না জানলে ভারতবর্ষকে জানা যায় না।

—**রাহুল চক্রবর্তী,**
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

# স্বস্তিকা পূজা সংখ্যা

বাংলা ১৪২২ সনের স্বস্তিকা পূজা সংখ্যা পড়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ ও রচনা অত্যন্ত সুন্দর হয়েছে, তবুও দু'একটা লেখা নিয়ে একটু মন্তব্য না করে পারছি না।

প্রথমেই আসি দেবব্রত ঘোষের 'বিজ্ঞানের আলোয় অবতার তত্ত্ব' লেখাটিতে। 'কর্দমাক্ত জায়গায়' মৃত্তিকা বিদারণকারী হলেন বরাহ অবতার বা নখের মাধ্যমে 'কেঁচোদের ধ্বংস করে' নৃসিংহদেব হলেন অবতার বা কুঠারহস্তে মাটিকে চাষযোগ্য করে পরশুরাম অবতার হয়েছেন— ওই সব ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তকে কী অবতারতত্ত্ব ও বিজ্ঞানসম্মত বলা যায়? তাছাড়া লেখকের মতে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' তত্ত্ব থেকে উদ্ধৃত হয়েছে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ 'এতে যেন একটা পরম্পরা সাব্যস্ত করা হয়েছে— যেটা বলতে আগে কেউ সাহস করেছেন বলে জানি না। 'গীতায় বলা হয়েছে ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন'— এই উক্তি শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় কোথাও নেই। এই উক্তি আছে প্রলয় গীতাতে একটি বিক্ষিপ্ত শ্লোক হিসেবে। যার সঙ্গে শ্রীমদভগবদ্গীতার কোনো সম্পর্ক নেই। পত্রের স্বল্প পরিসরে বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়। শুধু একটা কথা বলি কষ্টকল্পিত মন্তব্য যুক্ত প্রবাদগুলি সম্বন্ধে স্বস্তিকা আর একটু সতর্ক হলে ভাল হয়। প্রখ্যাত লেখক রামানাথ রায়ের 'প্রমাণ চাই' গল্পের নায়ক নিজের হাত ভাঙতে চাইছেন নায়িকার মন পেতে। এত দুর্বলচরিত্র নায়ক পাঠককে কী দিতে পারে? এরই পুনরাবৃত্তি পাই শ্রীমতী সুমিত্রা ঘোষের উপন্যাস 'তোরা কোন গগনের তারা' তে। এক দৃঢ় চরিত্রের নায়ক হঠাৎ ভেঙে পড়লেন এক বিতর্কিত চরিত্রের নায়িকার কাছে। স্ত্রী-পুরুষ উভয় চরিত্র চিত্রণে দুর্বলতাকে প্রাধান্য দিলে পাঠকের শিক্ষার কী থাকলো? স্বামীজী চেয়েছিলেন তাঁর দেশবাসী মানুষ হোক। তাদের থাকবে দৃঢ়চরিত্র, আত্মবিশ্বাস, ঈশ্বরভক্তি ও অদম্য সাহস। স্বস্তিকার লেখকদের কাছে প্রার্থনা তাঁরা দেশের বর্তমান দুর্দিনে আশা ও সাহসের আলো দেখান।

—**মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য,**
বিধাননগর উত্তর ২৪ পরগনা।

# আসুন, একটু ভাবি

চলুন, একবার পিছন ফিরে হাঁটি ১৯৯০ সালের ৩০ মে-র দিনটিতে। পৈশাচিক উল্লাসে সিপিএমের হার্মাদবাহিনী সেদিন অনিতা দেওয়ানের গোপন অঙ্গে দুই ব্যাটারির টর্চ প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিল। 'বর্তমান'-এর বরুণ সেনগুপ্ত ও সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত ছাড়া অন্য কবি, সাংবাদিক ও বিদ্বজ্জনেরা 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' অবলম্বন করে দাঁড়িয়ে থেকেছিল নিরাপদ দূরত্বে। তাই ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখতে চাইছি আজকের এই বহুচর্চিত, বহু উল্লিখিত নাগরিক সমাজ, সুশীল সমাজ বা বুদ্ধিজীবীদের তাঁদের বাংলার মাটিতে অবস্থান কোথায়? বৈদ্যুতিন ও মুদ্রণ মাধ্যমের কল্যাণে তো আজ বুদ্ধিজীবীরা পিছিয়ে। এগিয়ে রয়েছে কিছু নাট্যকার, নাট্য নির্দেশক, চিত্রশিল্পী, কণ্ঠশিল্পী বা শিল্পী যশোপ্রার্থীদের বিদগ্ধ মুখমণ্ডল যারা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বেশি পরিচিত হয়ে উঠেছে। এই নাট্যকারেরা স্বীয় স্বীয় সৃষ্টিতে ক্ষান্তি দিয়ে নাট্যচর্চায় অবসর নিয়ে টিভি চ্যানেলে রাজনৈতিক বিতর্কে কালাতিপাত করছেন। আর বুদ্ধিজীবীদের অগ্রগণ্য যাঁরা তাঁরা আমজনতার কথা ভাবেন কলকাতায় বসে ও উপগ্রহকুঞ্জের মতো বিরাজমান যশোপ্রার্থীর দল পরিবৃত হয়ে। দেশরক্ষায় আমাদের জওয়ানরা প্রতিদিন মারা যাচ্ছে। তাদের ওপারে ধরে নিয়ে গিয়ে জীবন্ত অবস্থায় অমানুষিক অত্যাচার করা হচ্ছে দেখেও আমাদের বুদ্ধিজীবীদের মুখে অমলিন হাসি। গজল সম্রাট হাসান সাহেব অবশ্যই সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী কিন্তু তাঁরও তো একটা মানবিক মুখ আছে। প্রতিনিয়ত ভারতের বুকে লুণ্ঠন, অত্যাচার ও সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী জঙ্গিদের বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠে এই ভারতের ত্রিবেণী তীর্থপথে একটি গান শুনতে চাওয়া কি অপরাধ? প্রাক্তন পাক বিদেশমন্ত্রী কাসুরির হাস্যকর সাফাই— 'আমি তো তখন বিদেশমন্ত্রী ছিলাম না' শুনেও এদেশের বুদ্ধিজীবীদের লজ্জা উদ্রেক হতে দেখেছেন?

কলকাতার একটি বাংলা দৈনিকে তো গত ১২ অক্টোবর এই বাংলার বিভিন্ন পুরস্কার প্রাপ্ত কবি সাহিত্যিকদের একটি তালিকা দিয়েছেন। সেই তালিকায় কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, মহাশ্বেতা দেবী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ আছেন। তাঁরা প্রতিবাদী কিন্তু ফেরত নাহি দিব পুরস্কার' ঘোষণার মাধ্যমে মহামতি গোখলের সেই বিখ্যাত বাণীটিকে উপহাসের বস্তুতে পরিণত করেছেন অনায়াসে। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর প্রচেষ্টায় মাত্র তিন মাসেরও কম সময়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ঘোষণা বা আমেরিকাবাসীদের আপ্লুত করে ডিজিটাইজড ভারত নির্মাণের পরিকল্পনা— বাংলায় মুদ্রিত সংবাদপত্রের সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের অন্ধ হয়ে থাকার কাজটি সত্যিই একটা আর্ট।

কিন্তু প্রশ্ন জাগে, সমাজের চিকিৎসক, শিক্ষক, অধ্যাপক, আইনজীবী বা সেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা কি সংবাদমাধ্যমের বিচারে দেশের জন্য মতামত দেওয়ার যোগ্য নয়?

আমরা প্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতির কথা পড়ি বই, পুঁথিতে। মায়া সভ্যতা, মিশরীয় সভ্যতা, রোমীয় সভ্যতা, গ্রীক সভ্যতা, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা--- সেইসব দেশের বহুবিধ পুস্তক ছিল আমাদের জ্ঞানের সূত্র। কিন্তু সবগুলিই উৎপাটিত ও মৃত— সবই ফসিলে পরিণত। খৃষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দ থেকে ১৯৪৭ প্রায় ২২ শত বছর বিদেশি রাজশক্তির হাত থেকে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি কোন প্রাণশক্তির বলে বেঁচে রইল— তা কি গভীর চিন্তা ও গবেষণার বিষয় নয়? ভারতবাসী আসুন, এই বিষয়টি নিয়ে একটু ভাবি।

—**অমলকান্তি বসু,**
বাগনান।

# পুণ্যক্ষেত্র নীলকণ্ঠ পাহাড়

**নীলমণি চক্রবর্তী**

কয়েকজন বয়োজ্যেষ্ঠ, ধর্মপ্রাণ লোকের সঙ্গে উত্তরাখণ্ডের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র 'হরিদ্বার' 'কনখল'-এ যেতে বাধ্য হলাম। সঙ্গী বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের ব্যবস্থাপনায় আমার স্থান হলো কনখলের দক্ষমন্দিরের কাছে এক আশ্রমের অতিথিশালায়। সেখানে গিয়ে আমি পড়ে গেলাম এক বিপদে। কারণ অচেনা-অজানা জায়গা। দ্বিতীয়ত, কোনো কাজ-কর্ম নেই। তৃতীয়ত, ওই সকল বয়োবৃদ্ধদের সঙ্গে আগডুম- বাগডুম কথা বলে সময় কাটানোর সাহস বা ইচ্ছে কোনোটাই ছিল না। এর থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে নিজেই একটা কর্ম-পদ্ধতি তৈরি করে নিলাম। ফলে সময়টা ভালোই কাটতে শুরু করল। সকাল-সন্ধ্যে আশ্রমের প্রার্থনা সভায় যোগদান করা ছাড়া যে বিশাল সময় হাতে থাকত তার সদ্-ব্যবহারের জন্য ছুটতাম দক্ষ-মন্দিরের দিকে। দেখতাম তাদের পূজা-পাঠ। মন্ত্রমুগ্ধ-র মতো তাকিয়ে থাকতাম সন্ন্যাসী ও বালব্রহ্মচারীদের দিকে। লক্ষ্য করতাম তাদের কত কঠোর নিয়ম নিষ্ঠাপূর্ণ পবিত্র জীবন। কখনো বা গিয়ে বসে থাকতাম মন্দির সংলগ্ন পবিত্র গঙ্গার পাড়ে। এমন সুন্দর মনমাতানো পরিবেশে নানা সুন্দর সুন্দর পৌরাণিক আখ্যান মনের মধ্যে ভিড় করত। মনে হোত সত্যিই কী এটি সেই স্থান যা ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে— 'শিবহীন যজ্ঞে দক্ষকন্যা সতী পতি-নিন্দা শুনতে না পেরে তনুত্যাগ করলেন। দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করে সতীর বিরহে কাতর মহেশ্বর তার শরীর কাঁধে তুলে নৃত্য করতে লাগলেন। মহেশ্বরের সেই মহাবিহ্বল আস্থা দর্শন করে দেবতারা শঙ্কিত।' অন্য একদিন সন্ধ্যের সময়ে শাস্ত্রের ওই

পরম্পরা

কথাগুলো মনে পড়ল— 'হরিদ্বারের পূর্ব দিকে মুক্তিক্ষেত্র মায়াপুরী কনখল— যেথায় ভগবতী দাক্ষায়নী সতী লীলা বিগ্রহ ধারণ করেন এবং নারীকুলকে পতিব্রতধর্ম-শিক্ষা-দানোদ্দেশে, পতিনিন্দা শ্রবণে পিতৃপ্রদত্ত দেহ বিসর্জন করেন। আবার মানবকে দাম্পত্য ধর্মজাত পরাপ্রেম শিখাবার উদ্দেশে সন্ন্যাসী হয়েও প্রেমিক-শিরোমণি দেবাদিদেব সতীদেহ স্কন্ধে করে উন্মত্তবৎ নৃত্যকালে নারায়ণ চক্র দ্বারা খণ্ড খণ্ড করে তা বিশ্বময় নিক্ষেপ করলে ৫১ মহাপীঠের সৃষ্টি হয়। এই মায়াপুরীই (কনখল)তার উদ্ভবস্থান। ...পাণ্ডারা বলেন, সতীশোকে প্রসূতির বিলাপ রব আজও রাত্রিশেষ হতে দিনের প্রথম প্রহর পর্যন্ত ভোঁ ভোঁ শব্দে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাকেই শোকোচ্ছ্বাস ডাডু বলে। এভাবেই কনখলে— আমি একাকী নিজের দিনগুলো বেশ সুন্দর ভাবেই কাটাচ্ছিলাম, কিন্তু 'বিধি বাম'। দু' একদিন পরে আমার বয়োজ্যেষ্ঠ এক সঙ্গী বেশ জোরের সঙ্গে নির্দেশ দিলেন--- আগামীকাল সকাল সাতটার মধ্যে আমাদের মন্দির গেটের সামনে সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকতে হবে। আমরা নীলকণ্ঠ পাহাড়ে যাব। কাজেই একরকম বাধ্য হয়েই, পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, সকালে মোটামুটি প্রস্তুত হয়ে গেটের সামনে দাঁড়ালাম। গাড়ি ছাড়ল সকাল সাড়ে সাতটায়। আরোহী সংখ্যা পাঁচ। আমি ছাড়া অপর চার জন সকলেই আমার অল্প পরিচিত ও বয়সে অনেক বড়। কাজেই আড্ডা বা ইয়ার্কির কোনো প্রশ্ন নেই। শুধু মাঝে মাঝে হুঁ, হা করা। বাদ বাকি সময় আমি একরকম বাধ্য হয়েই বাইরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দৃশ্যগুলো লক্ষ্য করছিলাম। দোকান-পাট সব খোলেনি, যাত্রীদের ভিড় তখনো জমেনি, গাড়ি ছুটছে দ্রুত গতিতে। নিমেষের মধ্যে এসে গেলাম হৃষীকেশে। হৃষীকেশে এসে যা দেখলাম তাতে চক্ষু চড়কগাছ! চতুর্দিকে

দোকান-পাঠ, সজোরে মাইক চলছে। যাত্রীদের ভিড়-চিৎকার, চেঁচামেচি। পবিত্র নদীবক্ষে কাতারে কাতারে লোক Rafting ব্যস্ত। স্পা ও রিসোর্টের ছড়াছড়ি। হায় হৃষীকেশ! তুমি কি সেই তপঃ ভূমি? যার কথা নানা পুঁথি-পত্রে বিধৃত হয়েছে— ''কুল, বেল, আম, ডুম্বুর ও দেবদারু প্রভৃতি পাদপ-পরিশোভিত হৃষীকেশের সৌন্দর্য অনুপম, হিমালয়ের এক উপত্যকায় অবস্থিত। চেতন জাহ্নবী অহর্নিশ হর হর রবে প্রবাহিতা। ...বস্তুত এমন শান্তিপূর্ণ স্থান জীবনে এই প্রথম মিলল। সহস্রাধিক সাধু সমাগম হেতু এঁর আর একটি নাম ফকিরাবাদ। ...শীত দুর্দান্ত, জীর্ণকুটিরে তৃণশয্যায় জাহ্নবী প্রসাদিবায়ু-পরশে নিদ্রা অসম্ভব। চৈতন্যদায়িনী ভগবতী হর হর রবে যেন বলছেন— তাপস! এ স্থান নিদ্রার নয়, ওঠ, ভগবৎধ্যানে নিরত হও, বস্তুত এ প্রচণ্ড শীতে ধ্যানযোগ বিনা দেহকে উষ্ণ রাখার উপায় নেই।'

অতীতের এই হৃষীকেশের সঙ্গে বর্তমানের হৃষীকেশের পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। বস্তুত বর্তমানে হৃষীকেশ আমোদ-প্রমোদের জায়গা হয়ে উঠেছে। বিষণ্ণ মনে একাকী এই সব ভাবছি। গাড়ি ছুটছে সোজা হাইওয়ে ধরে। বাঁ দিকে গঙ্গা হর হর ধ্বনিতে প্রবাহিত হচ্ছে। ডান দিকে ছোট ছোট পাহাড় নানা বৃক্ষরাজি দ্বারা পরিপূর্ণ। ইতিমধ্যে আমরা পার হয়ে এসেছি গরুড় চটি, সীমা ডেন্টাল কলেজ। ঝকঝকে সুন্দর রাস্তা। পরিকল্পনা মাফিক নানা বৃক্ষাদি লাগিয়ে পুরো পরিবেশ খুবই মনোরম করে তুলেছে। মন আনন্দে ভরে উঠেছে। গাড়িও সম্মুখে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। স্বল্পক্ষণের মধ্যে ঢুকে পড়লাম 'রাজাজী রাষ্ট্রীয় উদ্যানে।' অপূর্ব জায়গা, মনে হবে হঠাৎই যেন আমরা প্রবেশ করলাম এক নিবিড় বনানীর মধ্যে। বস্তুত নীলকণ্ঠ-পাহাড়ে যাওয়ার তাড়া থাকায় এই দৃষ্টিনন্দন জায়গাটা উপভোগ করা হলো না। তবু সময় থেমে থাকে না। গাড়ি ছুটে চলে, আরো কিছুক্ষণ চলার পরে এসে পড়লাম, আমাদের ঈপ্সিত স্থানে— নীলকণ্ঠ পাহাড়ে।

পৌঁছে দেখি বহু যাত্রীর ভিড়। গাড়ি পার্কিং-য়ের জন্য পড়েছে লম্বা লাইন। আমরা পরে এসেছি তাই স্বাভাবিকভাবেই অনেকটা দূরেই আমাদের গাড়িকে দাঁড়াতে হলো। গাড়ি থেকে নেমে সকলে মিলে ধীরে ধীরে সঙ্কীর্ণ পথে ভক্তদের ভিড় ঠেলে উঠে এলাম মন্দিরের মূল চত্বরে। সেখানেও ভক্তদের যথেষ্ট ভিড়। নিকটবর্তী দোকান থেকে সামান্য ফুল মিষ্টি কিনে দাঁড়ালাম ভক্তদের পুজো দেওয়ার লাইনে। মিনিট কুড়ি দাঁড়ানোর পর আমরা প্রবেশ করলাম নীলকণ্ঠ মহাদেবের গর্ভমন্দিরে। পুষ্পাঞ্জলি দিলাম তাঁর চরণে, সন্নিহিত আরো দু'একটি বিগ্রহ দর্শনের আমরা আবার মূল মন্দির চত্বরে পা রাখলাম। চা আমরা সবাই পান করলাম। এদিকে দর্শনের মধ্যাহ্নকালীন সময় পার হয়ে যাওয়ায় পাণ্ডারাও অতি ব্যস্ততার সঙ্গে মন্দিরের দরজা বন্ধ করতে আরম্ভ করলেন। ভক্তেরা পাহাড় থেকে নামতে উদ্যত হলো। আমরাও তাদের পিছু নিলাম। এবার পাহাড় থেকে নামলাম অন্য পথ ধরে— সিঁড়ি দিয়ে। শুনতে ভাল সিঁড়ি দিয়ে নামা, আমার সঙ্গী বয়স্ক লোকদের কাছে বেশ কষ্টকর। প্রথমত, অনেকগুলো সিঁড়ি, দ্বিতীয়ত খাড়া, খাড়া। আমি যতদূর পেরেছি ধরে ধরে তাঁদেরকে নামতে সাহায্য করেছি। নীচে নেমে এসে কাছাকাছি আরো দু'একটি মন্দির দর্শন করে আমরা ফিরে এসেছি। বাস্তবিকই খুবই শান্ত, স্নিগ্ধ, নির্জন মন-মাতানো স্থান। পূর্বে যে কিরূপ জাগ্রত তপস্যাপূত স্থান ছিল তা এখনো দেখলে বোঝা যায়।

আমরা প্রায় সকলেই হরিদ্বার, কনখলের কথা জানি। অনেকে ওই সব স্থানে অনেকবার গিয়েছেনও। কিন্তু নীলকণ্ঠ পাহাড়ের বিষয়ে অনেকেই অজ্ঞ। যাওয়া তো দূরের কথা। তাই আমরা শুনি ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্রশিষ্য বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের মুখ থেকে এ সম্বন্ধে— 'হৃষীকশের পূর্বদিকে গঙ্গার অপর পারে নীলকণ্ঠ পাহাড়। এটি একটি উচ্চতর শৃঙ্গ। দক্ষযজ্ঞ-বিনাশনে সতীদেহ স্কন্ধশূন্য (ভগবান বিষ্ণু সতীদেহকে খণ্ড খণ্ড করে শিবের মস্তক থেকে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দেন) দেখে প্রেমময় শঙ্কর বিশ্বসঙ্কটনাশ বাসনায় নির্বেদচিত্তে তাঁর হৃদিস্থ ব্রহ্মময়ীর অবাধ চিন্তা উদ্দেশে যে সমুচ্চ পর্বতে গমন করেন তার নাম নীলকণ্ঠ পর্বত। স্থানটি বড়ই মনোরম। নির্ঝরিণী ঝর ঝর রবে পীঠ প্রদক্ষিণ করে চলেছে। যেন বলছে— শান্ত হও, আমার মতো শিবগুণগানে শান্তি লাভ কর। পাছে যোগীশ্বরের ধ্যান ভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় চতুর্দিক নিস্তব্ধ।' এসব কথা মামুলি কথা নয়, বাস্তব। ধর্মের ব্যাপার সূক্ষ্ম ব্যাপার। সাধন-ভজনের ব্যাপার। সাধক ভিন্ন অন্য লোকদের পক্ষে ওই সব সূক্ষ্ম বিষয় উপলব্ধি করা অসম্ভব। মুখে বড় বড় কথা বললে হয় না। ধর্মস্থানে সাধন করলে যে মহৎ ফল উৎপন্ন করে তারই উজ্জ্বল উদাহরণ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের (বেলুড় মঠ) তপস্যা নীলকণ্ঠ পাহাড়ে। এই বিষয়ে সারদানন্দজীর জীবনীকার ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য লিখেছেন— 'শিবরাত্রির দিন (১৮৯০) সারদানন্দ (শরৎ মহারাজ দুই/তিনজন গুরুভ্রাতার সঙ্গে নীলকণ্ঠ শিব দর্শন করতে গিয়েছিলেন। ...সেখানে সমস্ত দিন উপবাসী থেকে পরম শিবের মহিমা চিন্তা করতে করতে শরৎ মহারাজ অপরাহ্ন সময়ে একাকী ইতস্তত পরিভ্রমণ করছেন। সহসা তিনি উপলব্ধি করলেন, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, তিনি পথহারা হয়েছেন। নিরুদ্বেগ চিত্তে যোগী (স্বামী সারদানন্দ) এক প্রস্তর খণ্ডের উপর আসন পরিগ্রহ করলেন এবং একখানি মোটা চাদরমাত্র গায়ে থাকায় পার্বত্য শৈত্য থেকে আত্মরক্ষার জন্য সমস্ত রাত্রি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় কাটালেন।'

নীলকণ্ঠ পাহাড় সংলগ্ন স্থানে বেশ কিছুকাল স্বামী সারদানন্দজী সাধন-ভজন করেছিলেন। প্রাপ্তি যোগ হিসাবে তিনি কী পেয়েছিলেন, সেই সম্বন্ধে সারদানন্দজীর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য— 'প্রভুর কৃপায় আজ হতে আমি মনের সঙ্গে পৃথক হয়েছি, মনের কার্যকলাপ আর আমাকে ভুলাতে পারবে না, এখন আমি যেন দ্রষ্টা।'

এইরূপ সদা জাগ্রত তপস্যাপূত জায়গায় এসে পড়লাম সম্পূর্ণ অযাচিত ভাবেই। ঈশ্বর আছেন কী নেই সেই সম্বন্ধেও বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই। তবু পুরোন সংস্কার যাবে কোথায়? আসার পথে মনে মনে নীলকণ্ঠ মহাদেবের চরণে প্রণতি জানালাম :

বৃষরাজ নিকেতনমাদিগুরুং
গরলাশনমাজিবিষাণধরম্।
প্রমথাধিপসেবক রঞ্জনকং, প্রণমামি শিবং
শিবকল্পতরুম্।। ■

## শ্রীচৈতন্য পরবর্তী নতুন ধারার মন্দির

## বাংলার মন্দিরে মন্দিরে

# জিনসরের প্রাচীন মন্দির

**ড. প্রণব রায়**

খড়্গপুর লোকাল থানার অন্তর্গত বহু প্রাচীন একটি ভগ্ন মন্দির কয়েকবছর আগে আবিষ্কৃত হয়েছে। খড়্গপুর থেকে মেদিনীপুরগামী ও.টি. রোড মোহনপুরে কাঁসাই সেতুর কাছে যেখানে মিলিত হয়েছে, সেখান থেকে পূর্বমুখী পাকা রাস্তায় প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে পাকা রাস্তার পাশেই গ্রামটি অবস্থিত নিকটবর্তী শহর মেদিনীপুর এখান আট কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। ৬নং জাতীয় সড়ক (বোম্বে রোড) পার্শ্ববর্তী। জিনসর বা জিনশহর-মেদিনীপুর জেলার পুরাকীর্তি পশ্চিম ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এখানে পুরাকীর্তির বিশিষ্ট নির্দশন পাথরের তৈরি একটি প্রাচীন ভগ্ন মন্দির পাকা রাস্তা থেকে কিছুটা উত্তরে অবস্থিত। মন্দিরের আশপাশ ও কাঁসাই তীরবর্তী এই স্থান একসময় লোকালয় পরিপূর্ণ ছিল অনুমান করা যায়।

জিনসর গ্রামের ধ্বংসপ্রাপ্ত এই প্রাচীন মন্দির এই গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী বালিহাটী গ্রামের সীমানায় অবস্থিত। মন্দিরের পূর্বদিকে নীলকুঠির যে ধ্বংসাবশেষ আছে, সেখান থেকেই প্রকৃতপক্ষে বালিহাট গ্রামের শুরু। তৎপার্শ্ববর্তী ‘ভোসলাপুকুর’ ও বালিহাটী গ্রামের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু প্রাচীন এই মন্দিরটি জিনসর গ্রামেই অবস্থিত।

জিনসরের এই মন্দির একটি জৈনমন্দির ছিল অনুমান করা যায়। জিনসর নামটি এই থেকেই এসেছে। মন্দিরটি মাকড়া পাথরে নির্মিত। মন্দিরের উপরিভাগ দীর্ঘকাল ভগ্ন থাকায় পূর্বমুখী এই মন্দির ‘পঞ্চরথ’-যুক্ত প্রাচীন একটি ‘শিখর’ মন্দির ছিল অনুমান করা যায়। নিচের ‘রাঢ়’ অংশের গর্ভগৃহই এখন একমাত্র অক্ষত আছে। ওপরের অংশ সম্ভবত নীলকুঠি তৈরির সময় ভোগলাপুকুরের যে ঘাট প্রস্তুত হয় সেসময় ধ্বংস হয়।

মন্দির প্রবেশ পথের দু-দিকে (পূর্বদিকে) গর্ভগৃহসংলগ্ন দু-পাশে দুটি কক্ষযুক্ত একটি অলিন্দ বা জগমোহনের ন্যায় কোনো ‘দ্বারমণ্ডপ’ বর্তমান ছিল, কিন্তু তা এখন ভেঙে গেছে, শুধু উত্তরাংশের পার্শ্বকক্ষটি বর্তমান। এই পার্শ্বকক্ষের পাশ দিয়ে ওপরে ওঠার সিঁড়ি বর্তমান লেখকের দৃষ্টিগোচর হয়। এ থেকে অনুমান করা যায়, মন্দিরটি প্রচলিত ‘রেখ’ বা ‘শিখর’ দেউল থেকে একটু স্বতন্ত্র ধরনের ছিল। সঙ্কীর্ণ গর্ভগৃহের চারপাশ প্রদক্ষিণপথ পরিবেষ্টিত। যদিও পরিদর্শনের সময় এই পথটির পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের দেওয়াল ভগ্ন ছিল। সামনের ‘দ্বারমণ্ডপ’ থেকে গর্ভগৃহপ্রবেশের মুখে প্রথমে দুটি ক্ষুদ্রাকৃতি দ্বারপথ, পরে প্রদক্ষিণপথ এসে পূর্বমুখী গর্ভগৃহদ্বার দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করা যায়। উত্তরদিকের দেওয়ালে জাফরিকাটা জানালা লক্ষণীয়। ভিতরের ছাদগুলি সবই লহরা’য় গঠিত প্রদক্ষিণপথের কোথাও কোনো বের হবার পথের (নিম্ন কক্ষপথ) চিহ্ন পাওয়া যায় না। মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে দু-একটি মূর্তি বেশ অস্পষ্ট হয়ে এসেছে উত্তরপূর্ব ও উত্তরদিকের বাইরের দেওয়ালে যে জাফরিকাটা জানালা আছে, তার ঠিক ওপরে যথাক্রমে একটি নরসিংহ ও সিংহমূর্তি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

এইসব দিক থেকে এই প্রাচীন মন্দির খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনুমান করা যায়, এটি চারপাশ প্রাচীরবেষ্টিত একটি জৈনবিহার ছিল। এই মন্দির থেকে পাওয়া একটি ‘ডোরজ্যাম্ব’-এ পাশাপাশি দণ্ডায়মান ছয়টি ক্ষুদ্রাকার জৈনমূর্তি লক্ষ্য করা গেছে।

মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল সঠিক বলা না গেলেও এটি প্রায় হাজার হাজার বছরের পুরানো অনুমান করা যায়। ■

## পুরাণের গল্প

নবাঙ্কুর

# স্যমন্তক মণি

যদুবংশীয় নৃপতি সত্রাজিৎ ছিলেন সূর্যের উপাসক। তিনি সূর্যের আসল রূপ দেখার বাসনা নিয়ে কঠোর তপস্যা শুরু করলেন। সত্রাজিতের তপস্যায় সূর্যদেব খুশি হয়ে তার সামনে উপস্থিত হলেন।

সত্রাজিৎ বললেন, 'সূর্যদেব, যদি কৃপা করে আমায় দর্শন দিলেন, তবে ওই গোলাকার উজ্জ্বল রূপ পরিত্যাগ করে আপনার আসল রূপ দর্শন করান।' সত্রাজিৎ এই কথা বলা মাত্রই চতুর্দিক আলোকময় হয়ে উঠলো। নানা বর্ণের শোভার মাঝখানে সাতটা ঘোড়ায় টানা অপূর্ব সুন্দর পুরুষ। ইনি সূর্যদেব। সূর্যের এই রূপ দেখে সত্রাজিৎ বারবার প্রণাম করে তাঁর বন্দনা করতে লাগলেন।

সূর্যদেব বললেন, 'আমি তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তোমাকে একটা অমূল্য মণি দান করছি।' —এই বলে তিনি একটা অতি উজ্জ্বল মণি সত্রাজিতের হাতে দিয়ে বললেন, 'এই মণির নাম স্যমন্তক মণি। এটা সাবধানে রাখবে। এর থেকে সোনা উৎপন্ন হয়, আর এর প্রভাবে দেশে অনাবৃষ্টি হবে না, ব্যাধি ভয় থাকবে না।' এই কথা বলে সূর্যদেব পুনরায় গোলাকার রূপ ধরে আকাশে উঠে গেলেন।

সত্রাজিৎ মণিটি সঙ্গে করে দ্বারকায় ফিরলেন এবং ভাই প্রসেনকে মণিটি রাখতে দিলেন। সে সেই সম্যন্তক মণি গলায় ঝুলিয়ে মৃগয়ায় যাত্রা করলেন। গভীর অরণ্যে শিকারের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে এক সিংহের সামনে এসে পড়লেন। আর সিংহও আচমকা প্রসেনের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। প্রসেন সিংহের আক্রমণে প্রাণ হারালেন। তাঁর গলা থেকে স্যমন্তকমণি ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল।

এমন সময় সেখানে ভল্লুকরাজ জাম্বুবান এল। জাম্বুবান সিংহকে দেখেই তাকে আক্রমণ করল। সিংহ সেই আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে তার হাতে নিহত হলো। জাম্বুবান সেই মণিটিকে নিয়ে তার গুহায় গেল।

এদিকে প্রসেন মৃগয়া থেকে ফিরছে না দেখে সত্রাজিৎ মহাচিন্তায় পড়লেন। কৃষ্ণকে সব কথা বলে তাঁর সাহায্য চাইলেন।

সত্রাজিতের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বনের মধ্যে গেলেন প্রসেনের খোঁজ করতে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর প্রসেনের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ পাওয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ সেই মৃতদেহ আর তার আশেপাশে সিংহের থাবার দাগ দেখে বুঝলেন প্রসেনকে সিংহই হত্যা করেছে। তিনি তখন সিংহকে মারার জন্য তার পদচিহ্ন অনুসরণ করে এগোতে থাকলেন। কিছুদূর গিয়ে দেখলেন সিংহটিও মরে পড়ে আছে। একটু অবাক হয়ে এদিক ওদিক খোঁজ করতে লাগলেন কে এই সিংহটিকে হত্যা করল! কিছুক্ষণপর তাঁর চোখ পড়ল ভল্লুকের পদচিহ্ন। সেই পদচিহ্ন ভালোভাবে পরীক্ষা করে বুঝতে পারলেন এ কোনো সাধারণ ভল্লুক নয়। শেষে দেখতে পেলেন একটা পাহাড়ের গুহার কাছে গিয়ে ওই চিহ্ন আর নেই। তিনি ঠিক করলেন এই গুহার মধ্যেই ভল্লুকটা আছে এবং গুহার মধ্যে ঢোকার সংকল্প করলেন। তাঁর সৈন্য সামন্তরা তাঁকে অনেক অনুনয় করে নিষেধ করলো, কিন্তু তাদের গুহার বাইরে অপেক্ষা করতে বলে শ্রীকৃষ্ণ একাই গুহার মধ্যে প্রবেশ করলেন।

গুহায় প্রবেশ করে শ্রীকৃষ্ণ অবাক হয়ে গেলেন। চমৎকার সাজানো গুহা। এবার তিনি বুঝতে পারলেন এটা ভল্লুকরাজ জাম্বুবানের প্রাসাদ। কারণ কোনো সাধারণ ভল্লুকের পক্ষে অত বড় সিংহকে বধ করা সম্ভব নয়।

শ্রীকৃষ্ণ চারিদিকে তাকিয়ে দেখছেন, এমন সময় সেখানে হাজির হলো ভল্লুকরাজ জাম্বুবান। তার লাল চোখ, বিকট দাঁত আর উদ্যত থাবা নিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করল। তিনিও প্রস্তুত ছিলেন। দুজনের প্রচণ্ড লড়াই শুরু হলো।

ভল্লুকরাজ জাম্বুবান ছিল মহাশক্তিশালী। শ্রীকৃষ্ণ সহজে তার সঙ্গে পেরে উঠল না। দিনের পর দিন সেই লড়াই চললো। অবশেষে জাম্বুবান পরাজিত হলো। তখন শ্রীকৃষ্ণ জাম্বুবানকে বললেন, এবার আমাকে ওই সম্যন্তক মণি ফেরত দাও।'

ভল্লুকরাজ বলল, 'আমি বুঝেছি আপনি ভগবানের অবতার। তা না হলে আমাকে পরাজিত করতে পারে এমন শক্তি মানুষের নেই। আপনি মণিটিতো পাবেনই, তার সঙ্গে আপনাকে উপহার দিলাম আমার কন্যা জাম্বুবতীকে। একে আপনি বিবাহ করুন।

শ্রীকৃষ্ণ সম্মত হলেন। তারপর জাম্বুবতীকে বিয়ে করে স্যমন্তক মণি-সহ দ্বারকায় ফিরলেন।

সত্রাজিৎ ভাই প্রসেনকে হারিয়ে খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহার আর সম্যন্তক মণি ফিরে পেয়ে খুব খুশি হলেন।

প্রশান্ত সেন

## মনীষী কথা

### রাজা রামমোহন রায়

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার ঢেউ আসে। এই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বাংলার যুবসমাজ সনাতন হিন্দু সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। এগোতে থাকে চূড়ান্ত অবক্ষয়ের দিকে। সেই সময় তাদের রক্ষাকর্তা হিসাবে আবির্ভাব ঘটে রাজা রামমোহন রায়ের। ১৮২৮ সালে তিনি ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। যা শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু সমাজকে অবক্ষয় থেকে রক্ষা করে। রামমোহন রায় কুসংস্কার মুক্ত সমাজ গঠনের জন্য নিরলস পরিশ্রম করেন। ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা রদ আইন পাশ করান। এছাড়াও নারী শিক্ষার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ভারতের সাংবাদিকতার ইতিহাসেও তিনি নজির স্থাপন করেছেন। তাঁর সম্পাদিত একটি সংবাদপত্র হলো মিরাত-উল-আখবার। রাজা রামমোহন রায় ছিলেন আধুনিক ভারতের অগ্রদূত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে 'ভারত পথিক' নামে আখ্যায়িত করেন।

## প্রশ্নবাণ

১.শহীদ মিনারের উচ্চতা কত?
২.কলকাতার বিড়লা তারামণ্ডল কত সালে তৈরি হয়?
৩.দক্ষিণেশ্বর ভবতারিণী মন্দির কে নির্মাণ করেন?
৪.বোটানিক্যাল গার্ডেনের নক্‌শা কে তৈরি করেন?
৫.ভারতীয় জাদুঘর বর্তমান কার অধীনে?

উত্তর : ১. ৪৮ মিটার। ২. ১৯৬৩। ৩. রাণী রাসমণি। ৪. রবার্ট কিড ও উইলিয়াম রক্সবোর। ৫। সংস্কৃতি মন্ত্রকের।

## ছবিতে অমিল খোঁজ

## শব্দের খেলা

*লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে*

(১) য় শ্ব বি ল বি
(২) ণ ম ন ই ল্যা

*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*

(১) অ য় ভ তো কু
(২) র নি ক্ষ খা রে

**৯ নভেম্বর সংখ্যার উত্তর**

(১) দুর্গতিনাশিনী (২) হংসবাহিনী

**৯ নভেম্বর সংখ্যার উত্তর**

(৩) বিক্রমাদিত্য (৪) মেঘমল্লার

**উত্তরদাতার নাম**

(১) অরিত্র নন্দ, এগরা, পশ্চিম মেদিনীপুর (২) অনন্যা বক্সী, তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর
(৩) অনুশ্রী হালদার, ট্যাংরা, কলকাতা-৪৬ (৪) সুশোভন ঘোষ, রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি

*সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।*

**উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়**

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : ৮৪২০২৪০৫৮৪
E-mail : swastika5915@gmail.com

*ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।*

# রেখেছ নারী করে মানুষ ভাবনি

**সুতপা বসাক ভড়**

যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।

যত্রৈতাস্তু ন পূজন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়া।।

—যেখানে স্ত্রীলোকের সম্মান নেই, স্ত্রীলোকেরা নিরানন্দে অবস্থান করে, সে সংসারের— সে দেশের কখনো উন্নতির আশা নেই।

মেয়েরা, ছেলেদের সমকক্ষ ভাবার কথা যতটা আমরা মুখে বলি, বাস্তবজীবনে কিন্তু তার প্রতিফলন দেখা যায় না। এখনও অনেক তথাকথিত শিক্ষিত পরিবারে কন্যাসন্তান কাম্য নয়। হয়ত বা সরাসরি বিরোধিতা বা অসন্তোষ দেখানো হয় না, তবে মেয়ের জন্ম যেন সান্ত্বনা পুরস্কার পাওয়ার মতো— ছেলে হয়নি, অগত্যা মেয়ে; ‘কোনো ব্যাপার নেই’, ‘বাবার অনেক টাকা আছে, মেয়ের বিয়ের চিন্তা করতে হবে না’ ইত্যাদি। তার ওপর মেয়ে যদি শ্যামবর্ণা হয় তবে তো খুবই দুঃখের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আত্মীয়-স্বজন সবাই মেয়ের মাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য হাজির। অনেক শুভানুধ্যায়ী কালো মেয়ের জন্য বেশি অঙ্কের জীবনবীমা করার উপদেশও দিয়ে থাকেন।

পুত্রসন্তানের জন্ম হলে বাবা সবসময় তার সঙ্গে নিজের মিল খুঁজতে ভালবাসে— ‘বাপ কা বেটা, সিপাহী কা ঘোড়া...’ আর মেয়ের বেলা মাকে শুনতে হয়, ‘তোমার মেয়ে, তোমার মতোই তো হবে!’ কী অদ্ভুত পরস্পরবিরোধী তুলনাত্মক বিচার? এরপর শুরু হয় মেয়ের পড়াশুনা। সাধারণত মেয়েরা পরিশ্রমী এবং অধ্যাবসায়ী হয়, এর ফল তারা পায়। পড়াশুনাতে ভাল হলেও বাড়ির পুরুষ অভিভাবকদের মন্তব্য, ‘ঠিক আছে; দেখ, কতদূর যেতে পারে।’ এরপর উঁচু ক্লাসে উঠলে প্রশ্ন ওঠে উচ্চশিক্ষার জন্য বাড়ির বাইরে পাঠানোর ব্যাপারে। বেশিরভাগ বাড়ির পুরুষদের মন্তব্য, ‘অসম্ভব! মেয়ে বড় হয়েছে, বিয়ে দেবার সময়, এখন বাড়ির বাইরে পাঠানো যাবে না, তবে হ্যাঁ, পড়াশুনা

**অঙ্গনা**

চলুক বাড়িতে থেকেই।’ দেখতে দেখতে একজন উচ্চশিক্ষিত ভাল পাত্রও জুটে যায়। অভিভাবকেরা খুশি। লেখাপড়া জানা পাত্র; সেই এবার মেয়ের দায়িত্ব নেবে— পড়াবে ও কেরিয়ার তৈরিতে সাহায্য করবে। খুব ঘটা করে শিক্ষিত মেয়ের সঙ্গে উচ্চশিক্ষিত ছেলের বিয়ে হয়ে যায়।

বিয়ের পর শিক্ষিত মেয়েটির চাকরি করা অনেক শ্বশুরবাড়ির অপছন্দ। ঘরে বসে পড়াশুনা ঠিক আছে, কিন্তু বাড়ির বউ চাকরি করলে ঘর কে সামলাবে, একথা অনেকেই বুঝে উঠতে পারেন না। সমাজে বড় বড় কথা বলবেন— নারীমুক্তি, নারীস্বাধীনতা, নারী-স্বাবলম্বনের তর্কে-বিতর্কে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবেন, অথচ ঘরের বউ যেন ঘরেই থাকে— ‘দিনকাল ভাল না’, ‘বউদের বাড়িতে থাকাই নিরাপদ’। অনেক সময় বউরা উপার্জন করতে চাইলে বাড়ির বয়স্করা উচ্চপদে আসীন মহিলাদের নাম নেন উদাত্তকণ্ঠে, বলেন, ‘চাকরি করলে তাঁদের মত করো’। আচ্ছা, ওঁরা কি একদিনেই ওই জায়গায় পৌঁছেছেন?

নারীকে অবদমিত করবে কে? শক্তির অংশ সে। ঘরের ভেতরে থেকেই অনেক মহিলা নানান কাজে নিজেদের উপার্জনশীল এবং আত্মনির্ভর করে তোলেন— যেমন বুটিক, পার্লার, রান্না শেখানো, নাচ-গান শেখানো, টিউশন ইত্যাদি। এর জন্য অনেককেও বাড়ির সদস্যদের বিশেষত পুরুষদের তির্যক মন্তব্য সহ্য করতে হয়। অথচ বাড়িতে থেকে বাড়তি পরিশ্রম করেই ওইসব মহিলারা উপার্জন করে থাকেন এবং সমাজে স্বীকৃতিও পান। আবার মন্তব্য হয়— ‘ফালতু লোকের কথায় কান দিও না।’। এমনও দেখেছি স্বামীর উপার্জন অপর্যাপ্ত হলে নিজস্ব বুটিকের মালকিন মহিলাটি স্বামীকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন, কিন্তু ওই স্বামীদেবতাটিই তার সঙ্গে ক্রেতাদের সামনে দুর্ব্যবহার করতে এতটুকু দ্বিধা করেননি। এইসব মহিলারা সময় বিশেষে যদিও বা ভেঙে পড়েন তবু মচকান না। তাঁরা চেষ্টা চালিয়ে যান, এগিয়ে যান, জীবনের পথে কিছু পদচিহ্ন রেখে যেতে চান তাঁরা। সংসার, সমাজ, সবকিছু সামলেই তাঁরা এগিয়ে যান। মহাপুরুষের বাণী তাঁরা তাঁদের হৃদয়ে গেঁথে নিয়েছেন, ‘দাগ কেটে যা...’। এই দাগ কাটার চেষ্টাতেই তাঁরা নিজেদের ব্রতী করেছেন। ■


জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

**স্বস্তিকা**

পড়ুন ও পড়ান

প্রতি কপি ১০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা

# পাক অধিকৃত কাশ্মীর পাকিস্তানের কবল থেকে মুক্ত হতে চায়

**অতিথি কলম**

মুজফ্‌ফর হোসেন

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তানের ধ্বংসের দিন শুরু হয়েছে। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে অপ্রাকৃতিক কোনো কিছু কখনো টিকে থাকতে পারে না। একদিন তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। রাষ্ট্রও প্রকৃতির একটি একক। এজন্য তাকে খণ্ড বিখণ্ড করা যেতে পারে না। এক সময় ঠিক তা আপন সত্তার সঙ্গে জুড়ে যাবেই। এই নিয়মের ভিত্তিতেই ভারত আবার অখণ্ড হবে। ভারতের বিভাজন প্রকৃতির বিরুদ্ধে করা হয়েছে। পরিস্থিতি অনুকূল হলে ভারতের অখণ্ড হওয়া স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। পাকিস্তানের অন্যায় ভাবে দখল করে থাকা 'অধিকৃত কাশ্মীর' থেকে ওঠা কণ্ঠস্বর এই প্রক্রিয়ার একটি পর্যায় নয় কি?

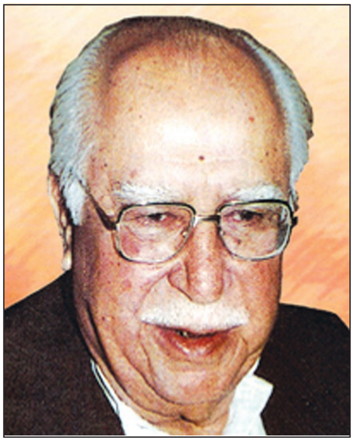

বালুচিস্তানের নেতা গাউস বক্স বিজেঞ্জো।

কিছু দিন আগে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক ইন্দ্রেশ কুমার অখণ্ড ভারত বিষয়ে বলেন যে, ১৯৩০ সালে রাভী নদীর তীরে তৎকালীন কংগ্রেস অখণ্ড ভারত ও পূর্ণ স্বরাজের শপথ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু মাত্র ১৭ বছরেই কংগ্রেস সেই সঙ্কল্প ভুলে যায়। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, স্বাধীনতার আগে রাজস্থানের জয়সলমীর ও পাঞ্জাবের অমরকোট হিন্দু রাজার শাসনাধীন ছিল। দুই রাজ্যের মধ্যে বিবাদ লেগেই থাকতো। স্বাধীনতার পরে অমরকোট সিদ্ধান্ত নেয় জয়সলমীর যা করবে তারা তার বিপরীত করবে। তখন জয়সলমীর ভারতে যুক্ত হয়, তাই অমরকোট পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হয়। হিন্দুবহুল অমরকোট আজ পাকিস্তানে সর্বনাশের কিনারে দাঁড়িয়ে। ইংরেজদের উদ্দেশ্য ছিল যাতে ভারত বিশ্বশক্তি হতে না পারে। এজন্য তাদের ধ্যান-জ্ঞান ছিল ভারত বিভাজন করা। অমরকোট কবে ভারতে যুক্ত হবে এটা বলা একটু বেশি বলা হবে, কিন্তু বাংলাদেশ তৈরি হওয়ার পর পাক অধিকৃত কাশ্মীর থেকে যে আওয়াজ উঠছে তাতে এই ইচ্ছাই ধ্বনিত হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ার একবার তাঁর ভাষণে বলেছিলেন যে, 'যদি ভারতবর্ষ দশ বছর আগে স্বাধীন হোত তাহলে পাকিস্তান নির্মাণই হোত না।' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আর্থিক লোকসান থেকে বাঁচার জন্যই পাকিস্তানের নির্মাণ করা হয়েছে। হাতিয়ে নেওয়া এই অংশ প্রকৃতপক্ষে মুসলমান নেতারা শত চেষ্টা করেও হজম করতে পারেনি। ক্ষতের ওপর পট্টি বেঁধে রাখলে তা লুকিয়ে রাখা যায় কিন্তু তার স্থায়ী চিকিৎসা হতে পারে না। এই ক্ষত এখন পাকিস্তানের পক্ষে ক্যানসারের রূপ ধারণ করছে। এটা এখন শুধু ব্যাধিরূপে নয়, বরং তা প্রাণ নিয়ে তার থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারে। সত্যি কথা এখন এটা ফোঁড়া হয়েই থেকে যাবে।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ পাক অধিকৃত কাশ্মীরে।

পাকিস্তানের অবৈধভাবে দখল করে থাকা কাশ্মীরে ১৯৮৮-'৮৯ পর্যন্ত চৌধুরী গোলাম আব্বাস ও সরদার আবদুল কাইয়ুমের জুড়ি তাদের কয়েকজন চাটুকারকে নিয়ে ক্ষমতা ভোগ করে। এই দুজন সময়ে সময়ে আপোশে তথাকথিত রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পদ রদবদল করে নিত। কিন্তু তাদের নিজেদের ঠাটবাট ঠিক রাখতেও যে কোনো কাজকর্মের জন্য ইসলামাবাদের কাছেই দাঁড়াতে হোত। ইসলামাবাদ তাদের কয়েকজন অনুচর ও আমলাকে নিয়ে একটা আলাদা বিভাগ তৈরি

করে দিয়েছে। তাদের ওপরই এই প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির গদি টিকে থাকতো। সবকিছু হওয়া সত্ত্বেও তারা একটা কেরানিকে পর্যন্ত বরখাস্ত করতে বা কাউকে নিয়োগ করতে পারতো না। এজন্য যখন পাক অধিকৃত কাশ্মীরের লোকেরা বাকি কাশ্মীরের লোকদের দেখত তখন স্বাভাবিকভাবে তাদের মনে তুফান উঠত। ফলে নিজেদের গোলামির শিকল ভাঙার জন্য তারা ব্যাকুল হয়ে উঠত।

এখন সেখানে যা চলছে তা অর্ধশতাব্দীর প্রতিশোধ। তাদেরই প্রতিবেশী বাকি কাশ্মীরের অধিবাসীদের সঙ্গে যখন তাদের আপোশে কথাবার্তা হয় তখন পাকিস্তানি শাসকের বিরুদ্ধে ঘৃণা ঝরে পড়ে। এখন সেখানে যা হচ্ছে তা ৬০ বছরের পুরনো রোগেরই পরিণাম। মিডিয়ায় সময়ে সময়ে এদের কণ্ঠস্বরও উচ্চে উঠতো, কিন্তু ইসলামাবাদ নিজের স্বপ্নেই বুঁদ হয়ে থাকতো। 'অধিকৃত কাশ্মীর পাকিস্তানের অঙ্গ নয়। এজন্য গিলগিট ও বালুচিস্তানের বিষয়ে তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার নেই। এই অংশ জম্মু-কাশ্মীরেরই অঙ্গ'— এই স্পষ্ট আদেশ পাকিস্তানকেই সর্বোচ্চ আদালত ২০০৮ সালে দিয়েছিল। কাশ্মীরে ভয়াবহ বন্যার সময় পাক অধিকৃত কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী ছাড়া অঞ্জুমান মিহাসে রসুল-এর অধ্যক্ষ মৌলানা সৈয়দ অজহর দেহলবি পাঁচদিন তাদের এলাকা সফর করে বলেন, 'যেভাবে ভারত সরকার যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বন্যাপীড়িতদের পাশে দাঁড়িয়েছে তাতে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মানুষ খুব খুশি। সেখানকার ৯৯ শতাংশ অধিবাসী ভারতের সঙ্গে থাকতে চাইছে।'

পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মানুষ পাকিস্তান সরকারের কাছে জবাব চাইছে যে, ১৯৬৩ সালে কাশ্মীরের ৫১৮০ বর্গকিলোমিটার এলাকা চীনকে উপহার দেওয়ার সময় কেন স্থানীয় জনতাকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি? জনমত সংগ্রহ করার আগে পাকিস্তানকে সমস্ত জায়গা খালি করে দিতে হবে— রাষ্ট্রসঙ্ঘের এই প্রস্তাবও পাকিস্তান মানেনি। কিন্তু পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরকে তাদের জায়গির মনে করে ছোট বড় সব পদে নিযুক্তি ইসলামাবাদ থেকে করে চলেছে। নিয়ন্ত্রণরেখার আশেপাশের জনবসতি হটিয়ে দিয়ে সেখানে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী, আফগান শরণার্থী এবং পাকিস্তান প্রেমী অপরাধীদের বসানো হয়েছে। এভাবে এই এলাকা আন্তর্জাতিক রাজনীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। চীনের সঙ্গে লাগোয়া সব দেশের হস্তক্ষেপ এটাই প্রমাণ করছে যে পাকিস্তান তাদের মাতৃভূমি নিয়ে ব্যবসা সবার সঙ্গে করছে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, বেশিদিন তাদের অংশের সুরক্ষা আর তারা করতে পারবে না। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের মানুষ বাকি কাশ্মীরের মানুষের সঙ্গে তাদের পবিত্র ভূমিকে রক্ষা করার সঙ্কল্প করে ফেলেছে।

পাক অধিকৃত কাশ্মীর আজ না হয় কাল ভারতের সঙ্গে যুক্ত হবেই। কিন্তু খোদ পাকিস্তানের দুটো বড় রাজ্য সিন্ধু ও বালুচিস্তানও স্বাধীন হওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। পাঠক খুব ভালভাবে জানেন, যে, বালুচিস্তান স্বাধীন হওয়ার জন্য গত কয়েক দশক ধরেই পা বাড়িয়ে আছে। বালুচিস্তান পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় আয়তনবিশিষ্ট রাজ্য। তা কখনো কারো অধীনে থাকতে চায় না। ওই রাজ্য ইরান ও আফগানিস্তানের সীমাবর্তী। এর সবচেয়ে বড় তটে গোয়াদর বন্দর। ভারত মহাসাগরের তীরে অবস্থিত এই বন্দর এশিয়ার মধ্য এবং উত্তর-পশ্চিম দেশগুলির সঙ্গে যুক্ত। যা শুধু কাজাকাস্তান ও তার আশেপাশে শুধু ৬টি দেশ নয়, বরং চীন ও রাশিয়া পর্যন্ত তার সীমা যুক্ত।

পাকিস্তানের সুরক্ষার দৃষ্টিতে গোয়াদর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বন্দর। কিন্তু এখানকার অধিবাসীরা কখনো মানসিক ও সাংস্কৃতিক রূপে নিজেদের পাকিস্তানের অংশ হিসেবে মেনে নেয়নি। তাদের ওপর যা ইচ্ছা চাপিয়ে দেওয়া হলেও তারা জন্মগত ভাবেই কারো গোলামিতে অভ্যস্ত নয়। এজন্য পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ এমন কোনো ব্যাপার নয়। ভৌগোলিক ও সামরিকরূপে এই প্রদেশ পাকিস্তানের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য এখানকার নেতা গউস বখ্‌স বিজেনজো পাকিস্তান তৈরির সময়েই জানিয়ে দেন যে, বালুচ জনতা কারো গোলামিতে থাকতে রাজি নয়।

গত কয়েক বছর ধরে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে বালুচদের সংঘর্ষ চলছে। পাকিস্তান সরকার কেবল ভৌগোলিক দৃষ্টিতেই নিজের অধিকারে রাখতে চায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেখানে কোনো সরকার সফল হতে পারেনি। পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ এই সময় অনিশ্চিতের মধ্যে চলেছে। আগামীদিনে যদি বিশ্বের মানচিত্রে কেবলমাত্র পাক- পাঞ্জাবই পাকিস্তানের পরিচয় বহন করে। তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিশেষভবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে, সরাসরি ব্যাঙ্ক মারফৎ বা মণিঅর্ডার যোগে স্বস্তিকায় টাকা পাঠালে সেই টাকা কী বাবদ পাঠালেন তা সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তিকা দপ্তরকে জানান। গ্রাহকদের টাকা পাঠালে তাঁদের সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা (ফোন নং-সহ) পাঠাতে হবে। অন্যথায় নাম না জানার কারণে আপনাদের পাঠানো টাকার কোনো রসিদ কাটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন গ্রাহকের টাকা পাঠানো সত্ত্বেও যেমন পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না, তেমনই বকেয়া টাকার কারণে কারও কারও পত্রিকা সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচতে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে আপনি যদি ব্যাঙ্ক মারফৎ স্বস্তিকাতে কোনো টাকা পাঠিয়ে থাকেন তাহলে কবে পাঠিয়েছেন, কত টাকা পাঠিয়েছেন এবং কি বাবদ পাঠিয়েছেন অনুগ্রহ করে সত্বর আমাদের জানান। ব্যাঙ্ক মারফৎ টাকা পাঠালে ব্যাঙ্ক যে রসিদ আপনাকে দেয় সেই রসিদের জেরক্স কপিটা আমাদের পাঠালে ভালো হয়।

— ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

# বালুচিস্তানের আইলান কুর্দিরা মালালার বিবেকও ছুঁতে পারলো না

**সাধন কুমার পাল**

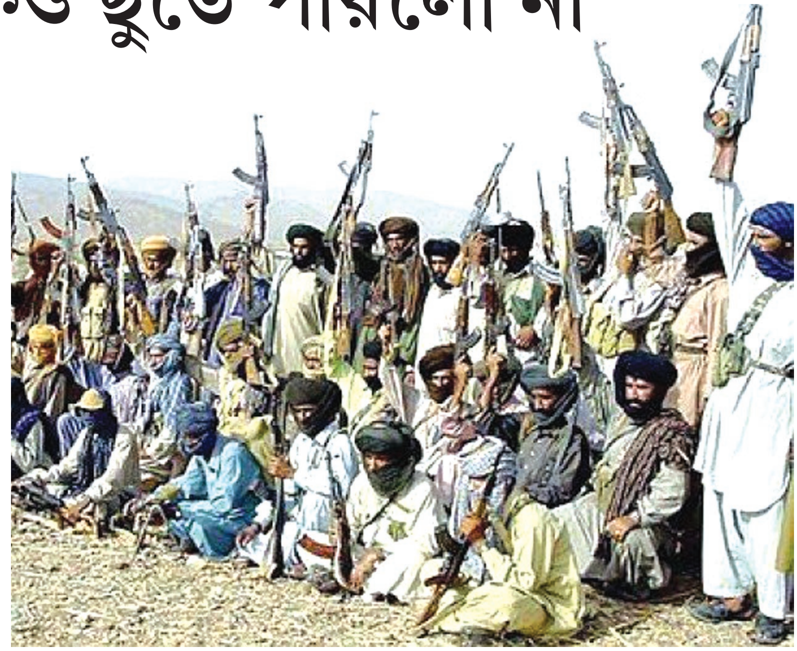

বালুচ স্বাধীনতা সংগ্রামী।

বিশুদ্ধ ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী আই এস-এর ভয়ঙ্করতম নরহত্যার দৃশ্য দেখে সমগ্র বিশ্ব যেন বিস্ময়ে, আতঙ্কে, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। তুরস্কের উপকূলে ভেসে আসা তিন বছরের আইলান কুর্দির মৃতদেহের মর্মান্তিক দৃশ্য সমগ্র বিশ্বের বিশেষ করে ইউরোপের বিবেককে জাগ্রত করে, মানবিক কর্তব্য সম্পাদনে তৎপর করে তুলেছে। কে শিয়া সম্প্রদায়ের, কে কুর্দ কিংবা ইয়েজিদি বা খৃষ্টান সম্প্রদায়ের অথবা কে সিরিয়ান, ইরাকি বা আফগানিস্তানি, কিংবা আফ্রিকান সে সব পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে প্রাণভয়ে ভীত, আতঙ্কিত বিপন্ন উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দানের ব্যাপারে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বৃহত্তর ঐক্যমতে পৌঁছানোর ঘটনা এই বিশ্বের মানবিকতার ইতিহাসে একটি বড় ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

ছোট্ট আইলান কুর্দি এখন দুনিয়াতে নেই। ওর মৃতদেহের মর্মান্তিক ছবি এখনো মানুষের হৃদয়কে বিদ্ধ করছে। এখনো মানুষ সোশ্যাল মিডিয়াতে এই হৃদয়বিদারক ছবি শেয়ার করছে। কিন্তু এটি একটি বড় স্ববিরোধিতা যে পশ্চিমি মিডিয়া ও মানুষের চোখে আই এস আই এস দ্বারা সংগঠিত সিরিয়া ইরাকের শিশুহত্যা, নরহত্যা, যৌন দাসী হিসেবে মহিলাদের কেনাবেচার ঘটনাগুলি মুখ্য হয়ে উঠলেও পাকিস্তানের বালুচিস্তানে গত প্রায় সাতদশক ধরে ঘটে চলা একই রকম ঘটনা কোনো অনুভূতি জাগাচ্ছে না। হ্যাঁ এটা সত্য যে নরমেধ, শিশুমেধ কিংবা যৌন দাসী কেনাবেচার মতো নিষ্ঠুরতম ঘটনা সমূহ উৎসবের মেজাজে কার্যকরী করার ভাবমূর্তি তুলে ধরার উদ্দেশ্যে জীবন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে, জলে ডুবিয়ে, এক কোপে কখনো বা ধারালো ছুরি দিয়ে পুঁচিয়ে পুঁচিয়ে মুণ্ডচ্ছেদের মতো কল্পনাতীত নৃশংস নিত্যনতুন উপায় উদ্ভাবন করে মনুষ্য হত্যা, সেই সঙ্গে ওই ভয়ঙ্কর সমস্ত দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করে দৃশ্য সোশ্যাল মিডিয়াতে পাকিস্তানি সেনার তাণ্ডবে মৃত বালুচিস্তানের 'আইলান কুর্দি'দের মর্মান্তিক হৃদয়বিদারক দৃশ্যও বিরল নয়। সংবাদমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় চোখ রাখলে এটা স্পষ্ট হবে যে নিজের দেশের মানুষের উপর চালানো বর্বরতার দিক থেকে বিচার করলে পাকিস্তানি সেনার তুলনা মেলা ভার।

বালুচিস্তান পাকিস্তানের পশ্চিমে অবস্থিত সবচেয়ে বড় প্রদেশ। এর আয়তন পাকিস্তানের মোট আয়তনের ৪৪ শতাংশ। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার মাত্র পাঁচ শতাংশ মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ বালুচিস্তানে বাস করে। ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ থেকে ২৭ মার্চ ১৯৪৮ পর্যন্ত বালুচিস্তান স্বাধীন পৃথক স্বাধীন রাজ্য ছিল। ১৯৪৮-এর ১১ আগস্ট বালুচিস্তানকে স্বাধীন রাজ্য মেনে নিয়ে পাকিস্তান একটি চুক্তিও স্বাক্ষর করে। কিন্তু এর কিছুদিন পরেই পাকিস্তান মহম্মদ আলি জিন্নার নির্দেশে বলপূর্বক বালুচিস্তানের শাসকদের দিয়ে জোর করে সংযুক্তি করণের দলিলে স্বাক্ষর করিয়ে নিজেদের অধিকার কায়েম করে। শুরু হয় বালুচিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রাম। বালুচরা এই সংগ্রামকে পঞ্চম স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে অভিহিত করে থাকে। বন্দুকের নল দিয়ে বালুচদের দাবিয়ে রাখার জন্য শুরু হয় পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় দমনপীড়ন। বালুচদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করার জন্য পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশের মানুষকে সেখানে বসবাসের জন্য বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

২০০৬ সালের আগস্ট মাসে অশীতিপর বালুচনেতা নবাব আকবর খান বুগতিকে হত্যা করা হয়। ২০০৫ এর ১৭ মার্চ পাকসেনা বালুচিস্তানের ডেরা বকুতি এলাকায় বোমা নিক্ষেপ করে, যাতে ৭০ জন মানুষের প্রাণ যায়। যাদের মধ্যে বেশিরভাগই মহিলা ও শিশু ছিল। ২০০ জনের বেশি মানুষ গুরুতর ভাবে আহত হয়েছিল। ২০১১ সালে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ প্রকাশিত এক রিপোর্ট বলছে, পাকিস্তান বালুচিস্তানের মানুষের উপর নিপীড়ন চালাচ্ছে, হঠাৎই গায়েব করে দেওয়া হয়েছে বহু মানুষকে। এদের মধ্যে অনেককে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছে। ১৯৯৯ থেকে

বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রায় কুড়ি হাজারেরও বেশি বালুচ আশ্চর্যজনক ভাবে নিখোঁজ হয়েছে। রিপোর্ট মোতাবেক এদের অনেককেই মেরে ফেলা হয়েছে। একটি রিপোর্ট বলছে, ২০০৩ থেকে ২০১২ পর্যন্ত বালুচিস্তান থেকে ৮০০০ মানুষকে পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনী অপহরণ করেছে। কেবলমাত্র ২০০৮ সালেই ১১০২ জন বালুচ অজ্ঞাত কারণে অদৃশ্য হয়ে গেছে। এই সমস্ত অপহৃত লোকেদের উপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের খবরও মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে। ২০১২ সালের ৭ এপ্রিল পাকিস্তানের ইকোনোমিস্ট পত্রিকার রিপোর্ট অনুসারে ২০১০- এর জুলাই মাস থেকে বালুচিস্তানের প্রত্যন্ত এলাকায় রাস্তার পাশে ৩০০-র মতো মৃতদেহ পাওয়া গেছে যাদের শরীরে পোড়া দাগ, হাত-পা ভাঙা, নখ-দাঁত ভাঙা, মাথার খুলিতে ড্রিল দিয়ে ফুটো করা। এগুলি সবই পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনী, আই এস আই ও ফন্ট্রিয়ার ক্রুপের 'কিল ডাম্প' অপারেশনের ফল। ২০১১ সালের জুলাই মাসে হিউম্যান রাইটস কমিশন অফ পাকিস্তান বালুচিস্তানে বেআইনিভাবে নিখোঁজ হওয়াদের নিয়ে একটি রিপোর্ট পেশ করে। যাতে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই, ফন্ট্রিয়ার ক্রুপই এই সমস্ত ঘটনার জন্য দায়ী বলে উল্লেখ করেনি। পাকিস্তানি রেঞ্জারও এই এলাকাতে বেশ ভালো সংখ্যায় মানবাধিকার হননের কাজ করেছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ আছে। পাকিস্তানি আদালতে পাঁচ হাজারের মতো বালুচিস্তানের নিখোঁজ সংক্রান্ত মামলা রয়েছে। একটি এ্যাপেক্স কোর্টের প্রধান বিচারপতি বালুচিস্তানে নিখোঁজ সমস্যা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করে পাকিস্তান সরকারকে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে বলেছেন। পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ইকবালের নেতৃত্বে গঠিত একটি এ্যাপেক্স কোর্ট পাক সরকারকে নিখোঁজ হওয়া পরিবারগুলিকে সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছে।

সংবাদমাধ্যমে রিপোর্ট অনুসারে ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে বালুচিস্তানের খুজদর জেলায় কিছু গণ কবরে ১৬৯টি লাশের সন্ধান পাওয়া গেছে। বালুচিস্তানের নিখোঁজ মানুষদের নিয়ে আওয়াজ ওঠানোর অপরাধে চলতি বছরের ২৪ এপ্রিল চল্লিশোর্ধ মানবাধিকার কর্মী সাবিন মামুদকে করাচির প্রাণকেন্দ্রে জনবহুল রাস্তায় আই এস আই এস-এর গুপ্ত ঘাতকদের হাতে প্রাণ দিতে হয়। নিজের দেশের সংবাদমাধ্যম, মানবাধিকার কমিশন ও আদালতের পর্যবেক্ষণ রিপোর্টের দিকে পাকিস্তান সরকারের কোনো ভ্রূক্ষেপ আছে বলে মনে হয় না। কারণ নাগরিকদের সুরক্ষা প্রদানের বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে পাকিস্তান সদা সর্বদা এই সমস্ত অবশ্য ঘটনার দায় ওই এলাকার স্বাধীনতাকামী বিভিন্ন গোষ্ঠীর উপর চাপাতে ও ভারতের বিরুদ্ধে এদের মদত দানের অভিযোগ তুলতেই বেশি আগ্রহী।

সরকারি ভাবে যাই বলা হোক না কেন বাজেট বরাদ্দেও বালুচিস্তানের প্রতি পাকিস্তানের অবহেলা ও বৈমাতৃসুলভ মনোভাব স্পষ্ট। ১৯৭০-এর মাঝামাঝি থেকে বালুচিস্তানের মোট বাজেট বরাদ্দ পাকিস্তানে জিডিপির ৪.৯ শতাংশ থেকে ৩.৭ শতাংশে নেমেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, রাস্তাঘাট, শৌচালয়ের মতো ন্যূনতম প্রয়োজনের অভাবে বালুচদের অনেকটা আদিম মানুষের মতোই প্রকৃতির দয়ায় জীবন নির্বাহ করতে হয়। বালুচিস্তানের মাত্র ৭ শতাংশ এলাকা এ ক্যাটেগরি এরিয়া যাতে প্রশাসনের অস্তিত্ব অনুভূত হয়। বাকি ৯৩ শতাংশ এলাকা বি ক্যাটেগরি। এমন অনেক এলাকা আছে যেখানে পশু ও মানুষ একই জলাশয়ে জল পান করে।

পাকিস্তানের সমস্ত প্রদেশের মধ্যে বালুচিস্তানের শিশুমৃত্যু, প্রসবকালীন মৃত্যু, দারিদ্র্য সূচক সর্বোচ্চ এবং শিক্ষার হার সর্বনিম্ন। বৃটিশ আমল থেকে যতটা উন্নয়ন হয়েছে সেটা পশতু সংখ্যাগরিষ্ঠ বালুচিস্তানের উত্তরাংশে। পাঞ্জাবি সংখ্যাগরিষ্ঠ পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে বালুচদের প্রতিনিধিত্ব নেই বললেই চলে। একই চিত্র পাক সেনা বাহিনীতে। পাক বংশোদ্ভূত কানাডার লেখক তাকেক ফতে- কে এক টক শো তে বলতে শুনেছিলাম পাক সেনা বাহিনীতে বালুচ রেজিমেন্ট নামে একটি রেজিমেন্ট থাকলেও সেখানে কোনো বালুচ নেই। পাকিস্তানে গণতন্ত্রের মজবুত ভিত্তি নেই। গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই ও সেনাবাহিনীই শেষ কথা। তবে বন্দুকের নল দিয়েও আজ আর আঞ্চলিক বৈষম্যজনিত ক্ষোভের আগুন চেপে রাখা যাচ্ছে না। আজাদির আওয়াজ উঠছে অধিকৃত কাশ্মীর থেকে, স্বাধীন হতে চাইছে গিলগিট-বাল্টিস্থান, সিন্ধুপ্রদেশ।

১৯৭১ সালেও আঞ্চলিক বৈষম্য, ভাষার দাবি ও পাক শাসকদের মধ্যে পাঞ্জাবি অধিপত্যের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছিল পূর্ব পাকিস্তান। বালুচিস্তানের কসাই হিসেবে পরিচিত জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর হিসাবে ঢাকায় প্রেরণ করা হয়েছিল। বিদেশি সাংবাদিককে ঢাকা পরিত্যাগে বাধ্য করে, চালানো হয়েছিল অপারেশন সার্চলাইট নামের গণহত্যাযজ্ঞ। এই হত্যা যজ্ঞে ২ লক্ষ থেকে শুরু করে ৩০ লক্ষ পর্যন্ত মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। যুদ্ধের সময় প্রায় এক কোটি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। এই মানুষগুলি সে সময় দেশত্যাগ না করলে লাশের পাহাড়ে পরিণত হোত পূর্ব পাকিস্তান। পাকিস্তান আর্মি বাংলাদেশের প্রায় ৩০০ জন বুদ্ধিজীবীকে যাদের মধ্যে রয়েছেন শিক্ষক, ডাক্তার, প্রকৌশলী, শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, ধরে নিয়ে যায় এবং নির্মমভাবে হত্যা করে। প্রায় ২ লক্ষ নারীকে ধর্ষিতা হতে হয়। পাক-সেনার এই বর্বরতা আজকের আই এস আই এসের তুলনায় কোনো অংশে কম নয়। এত কিছু করে পাকিস্তানের বিভাজন ঠেকিয়ে বাংলাদেশের জন্ম আটকানো যায়নি।

আজকের পাকিস্তানেও সেই ৭১-এর অস্থিরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। যা থেকে আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে পাকিস্তান কাশ্মীরকে ইস্যু করছে এবং অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা দমনে অনুসরণ করছে সেই পূর্বপাকিস্তানের দমনপীড়ন নীতি। অভ্যন্তরীণ স্ববিরোধিতার জেরে টুকরো টুকরো হয়ে পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে কিনা তা ভবিষ্যৎ বলবে। কিন্তু পাকিস্তানে প্রতি মুহূর্তে যে মানবতার মৃত্যু হচ্ছে তা দেখেও কেন মানবিকতা জাগ্রত হচ্ছে না তথাকথিত আধুনিক উন্নত দেশগুলির মিডিয়া গোষ্ঠী, তাবড় তাবড় রাষ্ট্র প্রধানদের। সে না হয় গেল পশ্চিমি মিডিয়া ও মানুষের কথা। তবে এটা বোধহয় বলতেই হবে যে বালুচিস্তানের আইলান কুর্দিরা, পাকসেনা ও আই এস আই-এর বর্বরতার শিকার পাকিস্তানি নারী পুরুষেরা বড় হতভাগা। কারণ ২৫ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সংবাদ সম্মেলনের সুর বলছে ওদের দুর্দশা, অত্যাচারিত হওয়ার দৃশ্য, বিকৃত মৃতদেহের আলোকচিত্র নিজের দেশের নোবেল জয়ী মালালা ইউসুফজাই এর বিবেকও ছুঁতে পারলো না। ■

# প্রসঙ্গ নেতাজী

ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

প্রথমেই বলে দিই, ‘স্বস্তিকা’ এলে আমি আগে গূঢ়পুরুষের ডায়েরি পড়ি অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎসাহের সঙ্গে। এই কথা আমি তাঁকেও বলেছি মহাজাতি সদনে আলাপের সময়।

গত ২৮ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় তাঁর ডায়েরিটা ছিল নেতাজী বিষয়ে। তিনি তাতে দুটো প্রশ্ন তুলেছেন— নেহরু সব জানতেন তাইহোকুতে নেতাজীর মৃত্যু হয়েছিল কিনা এবং রেঙ্কোজীর মন্দিরে রক্ষিত চিতাভস্ম কার?

প্রথমত, নেহরু ভালো মতোই জানতেন যে, তাইহোকু-কাহিনিটা সাজানো ব্যাপার। এবার মুখার্জী কমিশন একটা বিস্ফোরক তথ্য জানিয়েছেন। ১৯৫৪ সালেই তাইওয়ান সরকার নেহরুকে জানিয়েছিল— ১৯৪৫ সালের আগস্টে বা তার আগে-পরে ছয় মাসের মধ্যে তাইহোকুতে কোনো বিমান-দুর্ঘটনাই ঘটেনি।

নেহরু এই কথাটা চেপে রেখে নিজের স্বার্থে দেশবাসীকে প্রতারিত করেছেন। মনে হয়, তাইহোকু কাহিনিটা নেতাজীরই সাজানো নাটক। রাশিয়ায় গিয়ে আরব্ধ কাজ শেষ করার জন্য তিনি এটা সাজিয়েছিলেন। অভীষ্ট পূরণের জন্য তিনি এমনটা বারবার করেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলি— ১৯৪১ সালে এলগিন রোড থেকে পালানোর আগে কয়েকটা চিঠিতে পরবর্তী তারিখ বসিয়ে রেখেছিলেন। সেগুলো ভাইপো শিশির বসু পরপর পোস্ট করতেন। গোয়েন্দারা মনে করত তিনি তাঁর বাড়িতেই আছেন। এই রকম একটা চিঠি শিশিরবাবু তাঁর ‘দ্য গ্রেট এস্কেপ্’ গ্রন্থে রেখেছেন। চিঠির তারিখ ১৮ জানুয়ারি। অথচ তিনি আগের দিনই অন্তর্ধান হয়েছেন— (পৃ. ২৮-২৯)। তিনি জার্মানি থেকে জাপান পাড়ি দেওয়ার আগেও দুটো ভাষণ টেপ্ করেছেন— সেগুলো পরে শোনানো হয়েছে, তিনি তখন সাব্‌মেরিনে। হিউ টয় লিখেছেন— ‘To help conceal his departure, he had recorded two speeches for broadcasting after he left’— (দ্য স্প্রিংগিং টাইগার, পৃ. ৮৩)। মনে রাখতে হবে, নেতাজীর সেই তথাকথিত মৃত্যু-কাহিনিটা তাঁর শেষ বিমান-যাত্রার সঙ্গী হবিবুর রহ্‌মান দেশে ফিরে প্রচার করেছেন এবং নেহরু সেটা কাজে লাগিয়েছেন। কিন্তু মার্কিন গোয়েন্দারা জানিয়েছিল যে, হবিবুরের কথা বিশ্বাস করা যায় না— (সি-৫, ইন্টেলিজেন্স্ রিপোর্ট)।

মার্কিন সেনাপতি জেঃ স্যার আর্থার যে গোপন তদন্ত চালিয়েছেন, তাতেও এই বিষয়ে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এমনকী, তৎকালীন বড়লাট লর্ড ওয়াভেল লিখেছেন, ‘I suspect it very much, it is just what could be given out if he has meant to go underground’— (২৪.৮.৪৫)। আরও পরে— ২৪ সেপ্টেম্বর তিনি একই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন— (ভাইসরয়’স জার্নাল, পৃ. ১৬৪, ১৭৪)। ১৯৪৫ সালে বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেনও আমাদের রাষ্ট্রদূত এন. জিং গোরেবে জানিয়েছেন, ‘there is no official record of Subhas Chandra Bose's death in aircrash।’

নেহরু সব জেনেও দ্বি-চারিতা করে গেছেন। তিনি একবার লোকসভায় হরিবিষ্ণু কামাথকে বলেছেন, ঘটনাটা ‘settled without doubt।’

অথচ তিনি নেতাজীর অগ্রজ সুরেশচন্দ্র বসুকে জানিয়েছিলেন— ‘I cannot send you any precise and direct proof।’ তিনিই আবার শ্যামলাল জৈনকে একটা চিঠি লিখতে বলেছিলেন চার্চিলকে— তাতে ছিল, সোভিয়েট রাশিয়াই নেতাজীকে আশ্রয় দিয়েছে— এটা ঠিক কাজ হয়নি।

বড়লাটের শাসনপরিষদের সদস্য সি. এফ. মুভি ২৪ অক্টোবর বিলেতে নোট্ পাঠিয়েছেন নেতাজীকে নিয়ে কী করা যায়— তা নিয়ে কিছু বিকল্প প্রস্তাব তাতে ছিল। যেমন— (১) দেশে এনে বিচার করা বা (২) সেই দেশেই শাস্তি দেওয়া বা (৩) কোনো মিত্র-রাষ্ট্রে আনা ইত্যাদি। সব শেষে আছে— ভালো হয় ‘leave his where he is and don't ask for his surrender’— (দ্য ট্র্যান্সফার অফ পাওয়ার, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১০৭)। তার অর্থ— নেতাজী তখন বন্দী।

নেহরু এটা পড়েননি?

আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক ড. রাধাবিনোদ পাল এই নিয়ে একটা তদন্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সত্য উদ্ঘাটনের ভয়ে নেহরু দায়িত্ব দিয়েছেন শাহ্‌নওয়াজ খাঁকে। সেই কমিশনে সাক্ষীরা উল্টোপাল্টা কথা বলেছেন। তাতে অন্যতম সদস্য সুরেশচন্দ্র বসুর মনে হয়েছে তাইহোকু কাহিনিটাই ‘false and concocted’— (ডিজেন্সিয়েন্ট রিপোর্ট, পৃ. ১৪৩)। তবু সেই কমিশন কাহিনিটাকে সত্যি বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। সিদ্ধ হয়েছে নেহরুর উদ্দেশ্য।

এবার দ্বিতীয় প্রসঙ্গে আসি। শ্যামল বসুর ‘সুভাষ ঘরে ফেরে নাই’ গ্রন্থে আছে— চিতাভস্মগুলো শেয়াল বা কুকুরের। গোয়েন্দারাও জানিয়েছেন— ‘Ashes may not be those of a human being at all— (মেইন ফাইল, নং ১০, মিথ, আই. এন. এ. পৃ. ২৭৩)। মনমোহন সরকার সেগুলো দেশে এনে সাজিয়ে রাখতে চেয়েছিল।

এই সব নেতাদের কাছে নেতাজী মৃত্যুর আগেই ‘মৃত’। ■

*Swachchha Bharat   Swabolombee Bharat*

**How to build a nice home, think of us**

**WE PROVIDE :-**

+ Low Cost readymade Latrine (Toilet) + Low Cost House
+ Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant
+ Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

***Contact***

**ABC ENGINEERS & SERVICES**

**"PARK PLAZA"** Room No. 11 & 12, 71,
Park Street, Kolkata - 700 016
M : 98311 85740, 98312 72657,
Visit Our Website : www.calcuttawaterproofing.com



**কোটিপতি হোন!**

**নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন**

**মিউচুয়াল ফাণ্ডে SIP করুন**

১০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৩ পর্যন্ত SIP-তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের ফান্ড ভ্যালু বর্তমানে ৩২ লাখ টাকা।

যোগাযোগ : দেবাশিষ দীর্ঘাঙ্গী, শুভাশিষ দীর্ঘাঙ্গী

**DRS INVESTMENT**

Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond

9830372090
9433359382

মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।



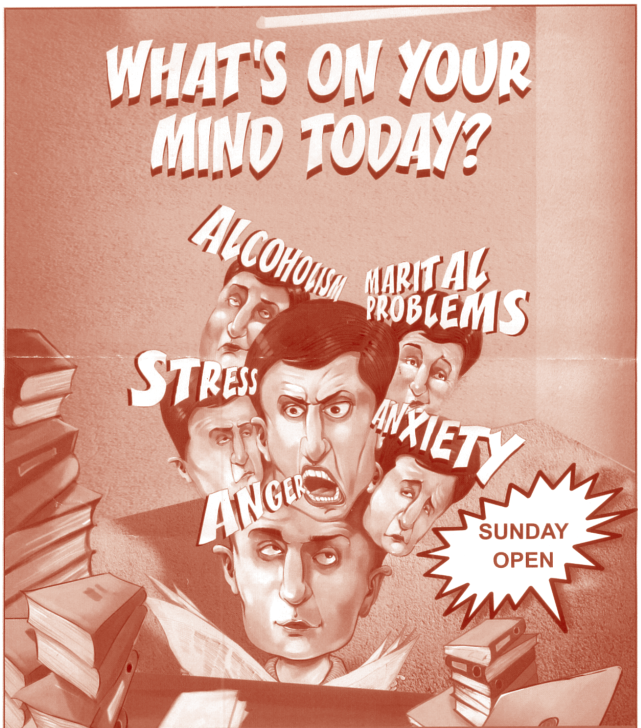


IQ Testing | Testing for ADHD, Dyslexia etc | Career Counselling
Psychological Counselling | Behaviour Clinic | Special Education
Psychiatry | Gynaecology | Nutrition Consultation | Hearing /Speech Clinic
Occupational / Pediatric Physio Therapy | Hand Writing Analysis

AFFORDABLE

AddLife
**CARING MINDS**
Psychological & Cognitive Wellness Centre

KOLKATA'S FIRST SUPER SPECIALTY
MENTAL HEALTH FACILITY
54A, Sarat Bose Road
+91 98364 03766 | +91 33 2475 1230
info@addlifecaringminds.com
www.addlifecaringminds.com
/AddLifeCaringMinds

A PATTON GROUP INITIATIVE


## আর্যভট্ট গুরুকুল বিদ্যালয়— একটি বৈদিক আবেদন

ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি তথা বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য বীরভূমের শান্তিনিকেতনের পাশেই ৩০ বিঘা জায়গার উপর একটি বাংলা মাধ্যম ও একটি ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয় ও একটি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এই কাজ শেষ করতে এখনও ৮৫ লক্ষ টাকা প্রয়োজন।

সকল হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের কাছে আমাদের আবেদন, প্রত্যেকেই যদি নিজেদের সাধ্যমত সাহায্য করেন তবে এই কাজ সহজেই হতে পারে। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার শান্তিনিকেতন শাখার ১০৫৯৮৫৪৪০৬৯ -এই এ্যাকাউন্ট নম্বরে যে কোনো অর্থ সাহায্য করতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো জায়গা থেকে ফোন করলে আমরা ব্যক্তিগতভাবেও সংগ্রহ করতে পারি।

এছাড়াও কেউ যদি তার পরলোকগত বাবা, মা, আত্মীয়-পরিজনের স্মৃতিতে একটি শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করে দেন তবে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ থাকবো। এর জন্য খরচ মাত্র দেড় লক্ষ টাকা।

এছাড়াও স্কুলে ব্যবহার করা যাবে এমন পুরনো অথবা নতুন আসবাবপত্র, বই অথবা যে কোনো জিনিস কেউ দান করেন তবে তাও সাদরে গৃহীত হবে।

সকল হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের সহযোগিতা কাম্য।

বিনীত,

সম্পাদক, আর্যভট্ট গুরুকুল বিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন

মোবাইল : ৯১৫৩২৬০১৬০

# রিক্সাচালক থেকে অধ্যাপক

অ-রকম

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** চেতন ভগতের লেখা 'ওয়ান নাইট ইন কলসেন্টার' বইতে এক জায়গায় বলা হয়েছে, 'ভগবান নিজে কোনো কাজ করেন না। কাজের চেষ্টা দেখে তার সার্থক রূপদানে সাহায্য করেন।' বইতে আরও উল্লেখ রয়েছে, 'জীবনে কার্যসিদ্ধি করতে হলে ভগবানের পায়ে শুধু মাথা ঠুকলেই হবে না। সেক্ষেত্রে ভগবান তোমার প্রতি প্রসন্ন নাও হতে পারেন। কিন্তু সফল হতে চাইলে যে কাজ তুমি করছ তাকে নিষ্ঠা সহকারে ভালোবাসতে হবে এবং প্রচণ্ড পরিশ্রম করে তা সফল করতে হবে। তবেই ভগবান তোমার কাজে সাফল্য আনতে সহায়তা করতে পারেন। যাতে তুমি সেই জায়গায় পৌঁছতে পারো'। এটি উল্লেখ করার কারণ হলো, কষ্ট না করলে কেষ্ট যে মেলে না তা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন ত্রিশ বছরের জগদীশ মীনা। প্রথম জীবনে রিক্সা চালালেও বর্তমানে তিনি একজন অধ্যাপক।

রাজস্থানের বসোয়া তহসিলের কারনাওয়ার গ্রামে বেড়ে ওঠা জগদীশের। ছয় ভাই বোন এবং বাবা মা-কে নিয়ে মোট আটজনের সংসার। এই দিন-আনা দিন-খাওয়া পরিবারটির রোজগেরে বলতে মাত্র দু'জন। অভাবের সংসারের মধ্যেও যতটা স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়া সম্ভব তা দিতে কার্পণ্য করেননি মীনা দম্পতি। স্বামী-স্ত্রী মিলে কৃষি জমিতে কাজ করে যেটুকু আয় করতেন তা দিয়েই ছেলে-মেয়ের লেখাপড়া এবং তাদের মানুষ করার চেষ্টা করেছেন। দু'জনে একসঙ্গে কাজ করলেও প্রচণ্ড টানাটানির মধ্যে দিয়ে তাঁরা সংসার চালাতেন।

*ছাত্রদের সঙ্গে অধ্যাপক মীনা।*

আর্থিক অনটনের কারণে ছেলে-মেয়েদের প্রাইভেট টিউশনের টাকাও এক এক সময় জোগাতে পারতেন না। অবশেষে জগদীশের বয়স যখন চোদ্দ তখন রিকশা চালাতে শুরু করে। অভাবের সংসারে যদি কিছুটা সাশ্রয় হয় সেই আশা নিয়েই জয়পুরে রিকশা চালাতে শুরু করে জগদীশ। কারণ সে জানত জয়পুরের কারনাওয়ার গ্রামের রিকশার খুব চাহিদা। তাই লোকে এই গ্রামে এসে রিকশা ভাড়া করে নিয়ে যেত। রিকশা চালানোর পাশাপাশি বিয়ে বাড়িতে ক্যাটারিং-এর কাজেও যেত জগদীশ। জগদীশের অকপট স্বীকারোক্তি, 'রিকশায় দু-তিন জন যাত্রীকে বসিয়ে রিকশা টানতে গেলে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যেত।' তবুও হাজারো কষ্ট সহ্য করে রণক্ষেত্রের রুক্ষ ভুমিতে দাঁতে দাঁত চেপে পড়েছিলেন জগদীশ। রিকশা চালাবার সঙ্গে পড়াশোনাও চালিয়ে যেতে থাকেন। জগদীশ বলেন, 'রিকশায় যাত্রী নিয়ে অনেকসময় জয়পুরের রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলেও ভিতরে ঢোকার সাহস আমার হোত না।' তবে তাঁর মনে ছিল অদম্য জেদ। তিনি মনে মনে জপতেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি একদিন অধ্যাপনা করতে আসবেন। কিন্তু মাথার উপর ছাদবিহীন জগদীশের ঠিকানা বলতে রাস্তার ফুটপাত। আর রাত্রে রিকশাতেই তিনি ঘুমাতেন। সুতরাং এরকম এক পরিবেশের মধ্যে তাঁর অধ্যাপনা করার স্বপ্ন 'ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা'র মতো। পরবর্তীকালে সেই স্বপ্নকে সফল করে দেখিয়েছেন জগদীশ। বর্তমানে তিনি রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন আর্টসের অধ্যাপক।

দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়াকালীন জগদীশ রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ে ফাইন আর্টস বিভাগে ভর্তি হন। সেই সময় হস্টেলে থাকতে শুরু করেন তিনি। কিন্তু সেখানকার ১ হাজার থেকে ২ হাজার টাকা হস্টেল ভাড়া দেওয়ার জন্য তাঁকে খুব কষ্ট করতে হোত। এমতাবস্থায় তাঁর বাবা-মাকেও তিনি তাঁর এই প্রয়োজনীয়তার কথা জানাতে পারেননি। তাই টিউশন পড়িয়ে, রিকশা চালিয়ে যেটুকু আয় হোত তা দিয়েই তিনি চালিয়ে নিতেন। পরবর্তীকালে এই কষ্টের মধ্যেই গ্রাজুয়েট হয়ে স্বর্ণপদক পান। রাজগড়ের একটি স্কুলে কাজ করার পাশাপাশি পিএইচ.ডি.-ও করেন তিনি। এ প্রসঙ্গে জগদীশ মীনা জানান, 'আজ আমি রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক, আজ আমার স্বপ্ন সার্থক হয়েছে।' ■

# যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

**স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,**

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

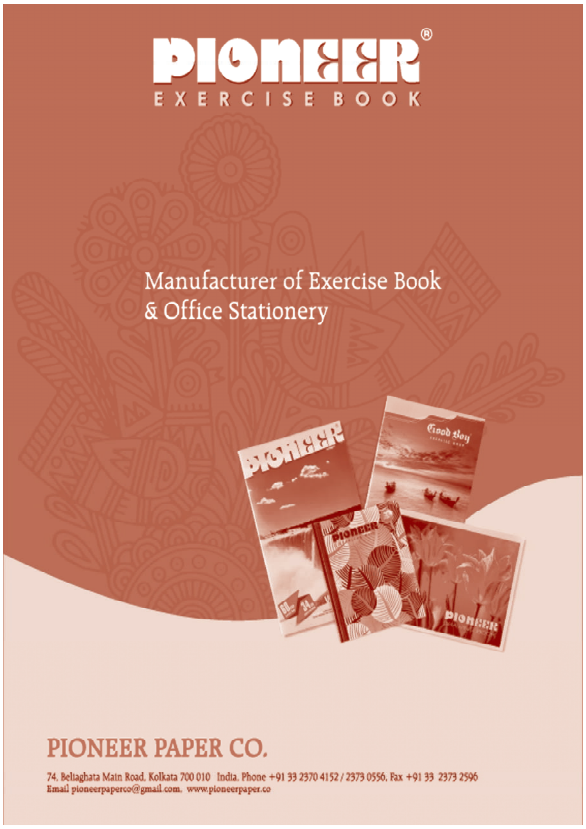



*'শিক্ষা যেন খননকার্যের মতো। আদর্শ নিয়ে এর আরম্ভ হয় আর শীর্ষদেশ থেকে শুরু হয় এর নির্মাণকার্য। মহৎ চিন্তা এবং তাকে কার্যে পরিণত করার সামর্থ্য অর্জন ভারতে শিক্ষার উদ্দেশ্য বলে বর্ণিত হয়েছে। সকল প্রকার সংস্কৃতিরই লক্ষ্য চরিত্রগঠন।*

*আমাদের শিক্ষাবিষয়ক ধারণাগুলিতে একটা প্রাণ থাকা চাই, একটা ঐক্য থাকা চাই। শিশুর সমগ্র বিকাশ নিয়ে ভাবতে হবে। যেমন হৃদয়বৃত্তির দিকটি দেখতে হবে, তেমনি মনের গঠনের দিকটিও দেখতে হবে।'*

*— ভগিনী নিবেদিতা*

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

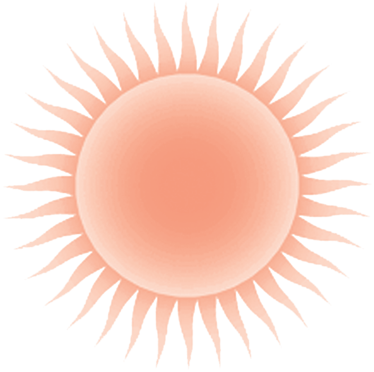

# সূর্যকিরণ চিকিৎসা

**ডাঃ কুশ কুমার**

সূর্য সমস্ত শক্তির উৎস হওয়ায় সূর্য কিরণে অপার রোগনাশক শক্তি লুকিয়ে আছে। এজন্য ঋকবেদে সূর্যকে রোগনাশক বলা হয়েছে। অথর্ববেদে সূর্যকে ঔষুধি বলা হয়েছে—সূর্যঃ কৃনোতু ভেষজম্। তাতে সূর্যকিরণের দ্বারা বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার কথা বলা হয়েছে। সূর্য উপাসনা ও সূর্যকে জল দেওয়া সূর্যকিরণ চিকিৎসারই একটা রূপ। সূর্যকিরণের মধ্যে নীল, লাল ও সবুজ রং-ই প্রধান। বাকি বেগুনি, কমলা, আকাশি ও হলুদ ওই তিন রঙের মিশ্রণ। বিভিন্ন রঙের গুণ বিভিন্ন রকম ফল প্রদান করে।

□ নীল, আকাশি, বেগুনি—শীতলতা ও শান্তি প্রদান করে।

□ লাল, হলুদ, কমলা—উষ্ণ এবং উত্তেজক।

□ হলুদ—সব রঙের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে।

সূর্যকিরণ চিকিৎসায় আলাদা, আলাদা রঙের ব্যবহার বেশি প্রচলিত। পরে চিকিৎসাপদ্ধতি সরল হয়েছে। প্রথম তিনটি রঙের মধ্যে নীল রং এবং বাকি রঙের মধ্যে সবুজ রং বেশি ব্যবহার করা হয়। চিকিৎসাপদ্ধতিতে সূর্যকিরণের দ্বারা জল গরম করে ব্যবহার করার রীতি সর্বাধিক।

□ **নীল জল**—নীল রঙ ঠাণ্ডা, শান্তিদায়ক, জীবানুনাশক ও গরম থেকে উৎপন্ন রোগে বিশেষ প্রভাবী হয়। এর ব্যবহারের ফলে মানসিক চাপ কম হয়। জীবাণুনাশক হওয়ার জন্য ক্ষতের পচন অবস্থাতেও বিশেষ লাভজনক হয়। শরীর গরম হওয়া, হাত-পায়ে জ্বালা, তৃষ্ণার তীব্রতা, খুব জ্বর, হাজা, অজীর্ণ, পাতলা পায়খানা, অনিদ্রা, মৃগী, পাগলামো, উচ্চ রক্তচাপ, মূত্র অবরোধ, মূত্রে জ্বালা, শরীরে বিষক্রিয়া এরকম রোগে নীল রঙের জল খুব লাভজনক হয়। নীল রঙের প্রয়োগ সবসময় ভোজন বা জলযোগের আধ ঘণ্টা আগে করা প্রয়োজন। বাতব্যাধি, সন্ধিপ্রদাহ, সন্ধিব্যথা, এবং ঠাণ্ডা লাগার ফলে জ্বর হলে নীল জল প্রয়োগ করতে হবে।

□ **কমলা জল** ঃ কমলা রঙ শরীরের দুর্বলতা ও অবশ হওয়া দূর করে। হজমশক্তি বৃদ্ধি করে। এই রঙ গরম, উত্তেজক, শক্তিবর্ধক হওয়ার জন্য ঠাণ্ডা লেগে হওয়া অসুখে খুবই লাভদায়ক হয়। অগ্ন্যাশয়, প্লীহা, যকৃত, অন্ত্র, ফুসফুসের রোগে খুবই লাভ হয়। আয়োডিনের অভাব দূর করে রক্তে লোহিত কণিকা বৃদ্ধি করে, বিছানায় প্রস্রাব করা, নিম্ন রক্তচাপ, স্নায়ু দুর্বলতা ইত্যাদি রোগ দূর করার ক্ষমতা রাখে। কমলা রঙের ওষুধ খাওয়ার ১৫ মিনিট পরে ব্যবহার করতে হবে। খালি পেটে পান করা একেবারেই নিষেধ। শিশুদের এক চামচ, কিশোরদের চার চামচ, বড়দের আট চামচ ব্যবহার করতে হবে। দিনে দুই অথবা তিনবার ব্যবহার করতে হবে। রোগের উপশম হতেই বন্ধ করে দিতে হবে।

□ **সবুজ জল**—সবুজ রঙ গরম ও ঠাণ্ডার মধ্যে ভারসাম্য রাখার কারণে গরম ও ঠাণ্ডাকে নিয়ন্ত্রিত করে। শরীরের দুর্গন্ধ দূর করতে, শরীরের তাপমাত্রায় ভারসাম্য রাখতে ও রক্ত পরিষ্কার রাখতে খুবই সহায়ক হয়।

আলসার, টাইফয়েড, বসন্ত, শুকনো কাশি, ক্ষত, পাথুরি, ইত্যাদি রোগে লাভদায়ক হয়। অন্ত্র, বৃক্ক, অন্ত্রাশয় ও ত্বকের রোগে সবুজ রং খুবই প্রভাবশালী হয়। শরীরে এই রংয়ের প্রভাব কম হওয়ার কারণে চর্মরোগ, ও রক্ত দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। চোখের রোগে এই রং লাভদায়ক হয়। সবুজ রঙের জল খাওয়ার এক ঘণ্টা আগেই খালি পেটে খেতে হবে। সবচেয়ে ভালো সকালে সন্ধ্যায় এক কাপ করে খাওয়া।

□ **রঙিন জল তৈরি করার পদ্ধতি** ঃ যে রঙের জল তৈরি করতে হবে সেই রঙের ভালোভাবে করা পরিষ্কার বোতলে শুদ্ধ জল ভরতে হবে। এক চর্তুথাংশ শুদ্ধ জল ভরতে হবে। বোতল কাঁচেরই হতে হবে। কোনোভাবে প্লাস্টিকের নয়। যদি সেই রঙের বোতল না পাওয়া যায় তবে সেই রঙের সেলোফেন পেপারে বোতল মুড়ে দিতে হবে। জল ভরার পর ভালো করে ছিপি এঁটে (প্লাস্টিকের হওয়া চলবে না) একটুকরো কাঠের ওপর রোদে রাখতে হবে। শীতকালে সাত-আট ঘণ্টা, গ্রীষ্মকালে পাঁচ-ছয় ঘণ্টা রাখলে সেই জল ঔষধি গুণ ধারণ করে নেবে। রোদ চলে যাবার আগেই বোতল এনে ঘরে কাঠের টুকরোর উপর রেখে দিতে হবে। একবার তৈরি হওয়া জল তিন দিন ব্যবহার করা যাবে। তিন দিন পর আবার নতুন জল ভরে রোদে রাখতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে একটি বোতলে অন্য বোতলের ছায়া যাতে না পড়ে। ■

# সংস্কার ভারতী-র অণুনাটক উৎসব

অণুনাটক অর্থাৎ ১৫ মিনিটের নাটক। বিদেশে এ নিয়ে চর্চা হলেও এদেশে এ বিষয়ে আমাদের প্রথম অবগত করেন বিশিষ্ট নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়। অণুনাটক আয়তনে ছোট হলেও তাকে সম্পূর্ণ নাটক হয়ে উঠতে হবে। একটি বড় মাপের বা ১ ঘন্টার স্বল্পদৈর্ঘ্যের নাটক যে যে শর্ত মেনে, যে স্ট্রাকচার অণুসরণ করে রচিত হয় অণুনাটকের সংক্ষিপ্ত পরিসরে এই নাট্যধর্ম বজায় রেখেই চলতে হবে। তবে গঠনের সব দিকটাতেই একটা দ্রুততা থাকবে। কম সময়ের নাটক বলে একই অনুষ্ঠানে বা একই মঞ্চে পাঁচ-ছ'টি অণুনাটক পরিবেশিত হতে পারে। এর ফলে নানা ধরনের নাটক তাদের বিভিন্ন থিম, ফর্ম এবং বিচিত্র স্বাদ দর্শকদের উপহার দেয়। এই বৈচিত্র্যের সম্ভার অণুনাটকের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি করে।

গত ৭ নভেম্বর সন্ধ্যায় রামমোহন হলে মোহিত চট্টোপাধ্যায় স্মরণে অণুনাটক উৎসবের আয়োজন করেছিল সংস্কার ভারতী। প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট অভিনেতা-নির্দেশক অসিত বসু। সংবর্ধনা জানানো হয় অণুনাটক বিকাশ মঞ্চের সম্পাদক প্রসাদ কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়কে।

উৎসবের প্রথম নাটক মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'দুটি মাথা একটি ছাতা'। দুই বৃদ্ধ। দু'জনের কাছেই ছাতা আছে। তা সত্ত্বেও পার্কে পড়ে থাকা একটি ছাতা নিয়ে টানাটানি। অবসর প্রাপ্ত জাজকে সালিশ মানায়। তিনি বলেন, আপনাদের দু'জনেরই প্রয়োজন মেটাতে একটি করে ছাতা আছে? ওরা বলে, আছে। জজসাহেব রায় দেন, আপনাদের চাহিদা মিটলেও তাতে সন্তুষ্ট না থেকে বাড়তি সম্পদের দিকে হাত বাড়াচ্ছেন। দুনিয়ায় এত অশান্তি, তার মূলেও এই বাড়তির দিকে লোভ। তাই এই ছাতাটি পাবে এমন একজন যার একটিও নেই। এই বলে তিনি পার্কের এক বাচ্চা যার ছাতা নেই তাকে ছাতাটি দিয়ে দেন।

দ্বিতীয় নাটকটিও মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের। 'ইন্টারভিউ'। এবং তৃতীয় নাটক চন্দন সেনের 'মৃত্যুর অধিকার'। পরপর এই তিনটি নাটক মঞ্চস্থ করে সংস্কার ভারতী। এরপর উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'সাক্ষী শেয়াল' বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যের পরিচালনায় অভিনয় করে গোবরডাঙ্গার রবীন্দ্র নাট্যসংস্থার কিশোর শিল্পীরা। বর্ণময় এই উপস্থাপনা দর্শকদের ভালো লাগে।

এদিন সন্ধ্যায় আর একটি নাটক শিবরাম চক্রবর্তীর হর্ষবর্দ্ধন-গোবর্দ্ধনের কয়েকটি মজার ঘটনা নিয়ে 'মামা-ভাগ্নে' শিবাশিস সেনগুপ্তের পরিচালনায় মঞ্চস্থ করে অগ্নীশ নাট্যগোষ্ঠী। সবশেষ নিবেদন সংস্কার ভারতীর 'ন হন্যতে'। বিকাশ ভট্টাচার্যের এই অণুনাটকে ফুটে উঠেছে বর্তমানের রাজনীতি–সমাজ বিরোধী আতাঁত ও তার সামনে সাধারণ মানুষের মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো।

বাহুল্যবর্জিত অনুষ্ঠান। প্রত্যেকটি নাটক—ছোট হলেও তার একটা মেসেজ বা বার্তা দর্শকদের কাছে পৌঁছে যায়। সংস্কার ভারতীর সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা রায় জানান, অণুনাটক নিয়ে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলবে। নান্দীপট নাট্যোগোষ্ঠীর প্রকাশ ভট্টাচার্য, আখর নাট্যগোষ্ঠীর ভদ্রা বসু ও অভিনেত্রী সর্বাণী ভট্টাচার্য সহ নাট্যজগতের আরও অনেকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

## সমাবেশ সমাচার

## শোকসংবাদ

কলকাতায় শ্যামাপ্রসাদ নগরের স্বয়ংসেবক তথা টাঁকশাল শ্রমিক সংঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক ও সর্বভারতীয় ফেডারেশনের যৌথ সম্পাদক অরুণ কুমার রায়চৌধুরীর পিতা সন্তোষ কুমার রায়চৌধুরী গত ৫ নভেম্বর নিজ বাসভবনে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর।

তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র ও দুই কন্যা রেখে গেছেন।

***

গত ৩ নভেম্বর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বড়মুড়া গ্রামের স্বয়ংসেবক নিরঞ্জন রায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। ১৯৯০ সালে তিনি অযোধ্যায় করসেবায় অংশ নিয়েছিলেন।

অকৃতদার রায় এলাকার সবার প্রিয় ছিলেন।

# দেবদূতের বস্ত্রবিতরণ অনুষ্ঠান

*বক্তব্য রাখছেন অদ্বৈতচরণ দত্ত, মঞ্চে (বাঁ দিক থেকে) বিজয় আঢ্য, সঞ্জীব আচার্য, তিনকড়ি দত্ত প্রমুখ।*

গত ১৮ অক্টোবর কলকাতায় বাগবাজার বলরাম মন্দিরের সামনে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দেবদূতের উদ্যোগে অষ্টম বর্ষ বস্ত্রবিতরণ অনুষ্ঠান হয়ে গেল। এই অনুষ্ঠানে প্রায় ২৯৮ জন পথশিশু ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া কিশোর-কিশোরীকে নতুন জামা প্যান্ট দেওয়া হয়। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন দেবদূতের সভাপতি ড. বিজয় আঢ্য, প্রধান অতিথি প্রখ্যাত চিকিৎসক শেখর ঘোষ, বিশেষ অতিথি অদ্বৈত চরণ দত্ত, তিনকড়ি দত্ত ও সেরাম গ্রুপের চেয়ারম্যান সঞ্জীব আচার্য।

এছাড়া এলাকার প্রায় পঞ্চাশ জন বিশিষ্ট শুভানুধ্যায়ীর হাত দিয়ে বস্ত্রবিতরণ করা হয়। মঞ্চে উপস্থিত সকলে তাঁদের বক্তব্যে এই কাজের প্রশংসা করেন ও সকলকে এই কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সঞ্জীব আচার্য কমপক্ষে একবার রক্ত পরীক্ষা করে থ্যালাসেমিয়া (বাহক কিনা জেনে) মুক্ত সমাজ গড়ার আহ্বান জানান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দেবদূতের শৈলেন পাল, অমলা বসাক, পূজা রায়, অনিমিখা পাল ও সম্পাদক জয়ন্ত সেন।

# ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের রাজ্য অধিবেশন

গত ৪ থেকে ৬ নভেম্বর ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের দ্বাদশ রাজ্য অধিবেশন শিলিগুড়ির সূর্যসেন কলোনির সারদা শিশুতীর্থে অনুষ্ঠিত হয়। গোমাতা পূজন ও পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে কার্যক্রমের শুভারম্ভ হয়। উদ্বোধনী কার্যক্রমে বিশেষ অতিথি ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিদ্যার বিভাগীয় প্রধান ডঃ পলাশ মণ্ডল, ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ-সভাপতি অজিত বারিক এবং অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক দীনেশ কুলকার্নি। রাজ্যের সংগঠনিক ২০টি জেলার মধ্যে ১৬টি জেলা থেকে জেলা কার্যকারিণী সমিতির ২১৫ জন কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্য অধিবেশনে ২১ জনের প্রাদেশিক সমিতি নির্বাচিত ও গঠিত হয়। এই কার্যকারিণী সমিতি আগামী ৩ বৎসর কার্যকর থাকবে। প্রদেশ সভাপতি হিসাবে নন্দলাল কাট এবং রাজ্য সাধারণ সম্পাদক হিসাবে কল্যাণ কুমার মণ্ডল নির্বাচিত হন। নব নির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন আধিকারিকের সঙ্গে পরামর্শ করে ২১ জনের সমিতি গঠন করেন। সহ-সভাপতি— গোপেন বেরা, স্বদেশ ঝা চক্রবর্তী, স্বদেশ ঘোষ। সম্পাদক— অরুণ মণ্ডল, রণজিৎ ঘোষ, প্রমোদ রায়, কোষাধ্যক্ষ—শঙ্করপ্রসাদ রায়, জৈবিককৃষি প্রমুখ ভানু থাপা, মহিলা প্রমুখ বিষ্ণুপ্রিয়া সরকার, শকুন্তলা সাহা এবং সংগঠন সম্পাদক অনিল চন্দ্র রায়।

নব গঠিত প্রদেশ সমিতি তিনটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন—(১) ধান-সহ অন্যান্য উৎপাদিত ফসলের লাভজনক মূল্য কৃষকদের সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করতে হবে। (২) কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে গো-হত্যা সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে। (৩) ক্ষেতমজুর অভাব দূরীকরণে সরকারের ১০০ দিনের কাজকে কৃষিকাজে লাগাতে হবে। (৪) সরকারি আইন করে লটারি বন্ধ করতে হবে।

এই অধিবেশনে ৩ জন কৃষি বিশেষজ্ঞকে সম্মানিত করা হয়। জলপাইগুড়ি জেলার অভিজ্ঞ নগেন্দ্রনাথ বর্মন, শ্রীবাস কীর্তনিয়া ও দীপ্তি কীর্তনিয়াকে।

অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক দিনেশ কুলকার্নি বলেছেন, ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ দেশের সর্ববৃহৎ কৃষক সংগঠন। এই সংগঠন অ-রাজনৈতিক এবং কৃষকদের দ্বারাই পরিচালিত, কৃষক ও কৃষির স্বার্থেই সামাজিক ও পারিবারিক সংগঠন। দেশ পরিচালনায় যে সরকারেই ক্ষমতায় থাকুক শক্তিশালী সংগঠন হলো সরকারের দণ্ড স্বরূপ। অর্থাৎ সরকার কৃষি ও কৃষক বিরোধী নীতি গ্রহণ করলে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো।

# নিমতায় সমাজসেবা ভারতীর রক্তদান শিবির

সমাজসেবা ভারতীর উদ্যোগে এবং নিমতা শিবায়নের পরিচালনায় গত ৪ অক্টোবর নিমতা স্কুল প্রাঙ্গণে R. G. Kar Medical College-এর তত্ত্বাবধানে এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির

অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমতী শম্পা দাসের উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠানটির সূচনা হয়।

এরপর শ্রীমতী সোনালী চ্যাটার্জী নিজের লেখা নেতাজীর উপরে একটি প্রতিবেদন পাঠ করেন। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কর্নেল সৌমিত মুখার্জী (অবসরপ্রাপ্ত), বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ বঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ ড. জিষ্ণু বসু। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজ সেবা ভারতী পশ্চিমবঙ্গের সদস্য ডঃ সনৎ বসুমল্লিক, ডঃ জগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত চট্টোপাধ্যায়, ডঃ অংশুমান বিশ্বাস, শ্রীমতী আলোরাণি সরকার, রণজয় বিশ্বাস, বিশ্বনাথ বৈদ্য, মৃত্যুঞ্জয় পাল, অমরজিৎ বোস প্রমুখ।

---

## পরলোকে অশোক সিংহল

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রাণপুরুষ অশোক সিংহল গত ১৭ নভেম্বর বেলা দুটো নাগাদ গুরগাঁওয়ে এক বেসরকারি হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। শ্বাসকষ্টজনিত কারণে তিনি অসুস্থ ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে রামজন্মভূমি আন্দোলন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বৎসর।

# পরলোকে মধুকর লিমায়ে

উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রবীণ সঙ্ঘ-প্রচারক মধুকর বিশ্বনাথ লিমায়ে আর নেই। গত ৪ নভেম্বর মুম্বই লোয়ার প্যারেল সঙ্ঘের কার্যালয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বৎসর। মধুজী নামে তিনি সুপরিচিত ছিলেন।

খুব ছোটবেলাতেই তিনি সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হন। মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে এম এসসি পাশ করে ১৯৪৮ সালে স্বদেশ ও সমাজ সেবায় সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে আত্মোৎসর্গ করেন। প্রথমে মহারাষ্ট্রের পালগড় মহকুমায় ও পরে ১৯৫০-এ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সঙ্ঘের কাজ দৃঢ় করার লক্ষ্যে তাঁকে অসমে পাঠানো হয়। সেই তখন থেকে অসমই ছিল তাঁর ঘরবাড়ি। ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি অসম তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সঙ্ঘের কাজের প্রসারের জন্য সেখানকার প্রত্যন্ত অঞ্চল ও স্পর্শকাতর স্থানগুলিতেও গিয়েছেন।

মধুকরজী মারাঠি, হিন্দি, সংস্কৃত, ইংরাজি, বাংলা ও অসমীয়া ভাষা জানতেন। তিনি একজন সুলেখকও। হিন্দি ভাষায় তাঁর রচিত 'খট্টি মিঠি বনতে' সমাজ জীবনের এক অপূর্ব স্মৃতিচারণ। তাঁর সাহিত্যকৃতির জন্য উত্তরপ্রদেশ সরকার ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী-র মাধ্যমে তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে। মাই হোম ইন্ডিয়া-র পক্ষ থেকে তাঁকে মর্যাদাপূর্ণ 'ওয়ান ইন্ডিয়া অ্যাওয়ার্ড' সম্মানে ভূষিত করা হয়। উত্তর পূর্বাঞ্চল ও সেখানকার মানুষদের জন্য তাঁর অবদানের কথা স্মরণ রেখে এই পুরস্কার তাঁকে দেওয়া হয়। এক সঙ্কটময় সময়ে সঙ্ঘ কাজের প্রসারের জন্য তাঁকে অসমে পাঠানো হয়েছিল। ভৌগোলিক দিকে থেকে অসম ছিল দুর্গম এবং একই সঙ্গে মূল ভূখণ্ড থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন। ১৯৪৮ সালে সঙ্ঘের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তখন সবেমাত্র প্রত্যাহার করা হয়েছে। সঙ্ঘের বিরুদ্ধে অপপ্রচার তখন তুঙ্গে। এইরকম এক পরিস্থিতিতে অসমে তিনি সঙ্ঘের কাজের দায়িত্ব নিয়ে এসেছিলেন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছনোর জন্য সবরকমের যানবাহনেরই সাহায্য তিনি নিয়েছিলেন, যদিও প্রথম দিকে সাইকেলই ছিল তাঁর প্রিয় বাহন। নম্রতা ও মিষ্ট ভাষার মাধ্যমে অসমের বহু বুদ্ধিজীবীকে তিনি প্রভাবিত করে হিন্দুত্বের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। নওগাঁর বিভাগ প্রচারক, বৌদ্ধিক প্রমুখ, সহ-প্রান্ত প্রচারক ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ক্ষেত্র প্রচারক প্রমুখের দায়িত্ব তিনি বহন করেছেন। অসীমায়া সাপ্তাহিক 'আলোক' প্রকাশেও তিনি অগ্রণীর ভূমিকায় ছিলেন। বস্তুত তিনি ছিলেন এক নিষ্কাম কর্মযোগী। মানুষটির প্রয়াণে দেশ এক সুসন্তানকে হারাল।


সবার প্রিয় ®
বিল্লদা
চানাচুর

'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

রঙ্গম

# শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি

# বিকাশ রায়

**বিকাশ ভট্টাচার্য**

বাংলা চলচ্চিত্র জগতের বিশিষ্ট একটি নাম বিকাশ রায়। একাধারে প্রযোজনা, পরিচালনা ও অভিনয়— তিনদিকেই তিনি অসামান্য দক্ষতার অধিকারী। ১৯১৬ সালে তাঁর জন্ম। প্রেসিডেন্সি কলেজের স্নাতক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এল. এল. বি.। আদালত চত্বরে না গিয়ে তিনি এলেন স্টুডিও ফ্লোরে।

তাঁর প্রথম দিকের বেশ কিছু ছবিতে তিনি নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। যেমন 'রত্নদীপ' বা 'ছেলে কার'। পরে ধীরে ধীরে তিনি চরিত্রাভিনয়ে চলে আসেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বেশ কিছু দেশাত্মবোধক ছায়াছবি মুক্তি পায়। পরিচালক হেমেন গুপ্তের 'ভুলি নাই' (৪৮) ও '৪২' (৫১) এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ৪২ ছায়াছবিতে বিকাশ রায় এক অত্যাচারী বৃটিশ পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় অসামান্য অভিনয় করেন। কাননদেবী প্রযোজিত ও হরিদাস ভট্টাচার্য পরিচালিত 'অভয়া ও শ্রীকান্ত' ছবিতে নন্দ মিস্ত্রির ভূমিকায় তাঁর অভিনয় ভোলা যায় না। তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য ছবি 'কাঁচ কাটা হীরে'। অজয় কর পরিচালিত এই ছবিতে এক ব্যক্তিত্ববান শিল্পপতির চরিত্রে তিনি যেন চরিত্রের সঙ্গে মিশে গেছেন।

অগ্রদূত পরিচালিত 'সূর্যতোরণ' ছবিতে উত্তমকুমারের সঙ্গে সমানে সমানে অভিনয় করেছেন এক ট্রাজিক চরিত্রে। 'জীবন কাহিনী' ছবিতে এক ঋণভারে জর্জরিত দরিদ্র ইনস্যুরেন্স এজেন্টের চরিত্রে ছিলেন তিনি। এক হতাশ বেকার যুবক গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরতে যাচ্ছে, তাকে নিয়ে এলেন নিজের বাড়িতে। বুঝিয়ে-সুজিয়ে লক্ষাধিক টাকার পলিসি করালেন। নমিনি তিনি। প্রিমিয়াম তিনিই দিলেন। বললেন, মাস ছয়েক পরে মরতে। ধার করে তার খাওয়া দাওয়া চালাতে লাগলেন। সময় আসলে সেই যুবক আর মরে না। সে ওই এজেন্টের মেয়ের প্রেমে পড়ে নতুন ভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখছে। এই ছবিতে বিকাশ রায়ের অভিনয় ভোলা যায় না।

তপন সিংহ পরিচালিত উত্তম-অরুন্ধতি অভিনীত 'জতুগৃহ' বিকাশ রায়ের আর এক অসামান্য অভিনয়ের স্বাক্ষর। এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী পার্টি- সর্বস্ব স্ত্রীর কর্মক্ষেত্রে অসফল এক হতাশ স্বামীর ভূমিকায় তাঁর অভিনয় মনে দাগ কেটে যায়। তবে এই অসামান্য অভিনেতার জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয় আমার মতে বিজয় বসু পরিচালিত 'আরোগ্য নিকেতন'। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত এই ধ্রুপদী উপন্যাসে প্রাচীন ও নবীন ধ্যানধারণার সংঘাত দেখানো হয়েছে। গ্রামের পুরুষানুক্রমিক আয়ুর্বেদাচার্য জীবনমশায় নাড়ি টিপে মানুষের মৃত্যুর কথা বলে দিতে পারেন। দু'একজন রোগীকে তিনি নাড়ি টিপে দেখে জবাব দিয়ে দিয়েছেন। গ্রামের হাসপাতালে কলকাতা থেকে আসা পাশ করা যুবক চিকিৎসক এ ধরনের চিকিৎসার ঘোর বিরোধী। উভয়ের সংঘাত এই ছবির মূল আকর্ষণ। এ ছবিতে বৃদ্ধ জীবন মশায়ের অসামান্য অভিনয় চোখে জল এনে দেয়।

কোনটা ছেড়ে কোনটা বলব। 'ছেলে কার', 'অভয়া-শ্রীকান্ত', 'ছদ্মবেশী'— এসব ছবিতে তাঁর কমেডি অ্যাকটিং যেমন দেখার মতন তেমনি ট্রাজিক চরিত্রে তাঁর মর্মস্পর্শী অভিনয় 'সূর্যতোরণ', 'উত্তর ফাল্গুনী', 'মায়ামৃগ' প্রভৃতি ছবিতে আমরা দেখেছি।

অভিনয়ে যখন তিনি খ্যাতির শীর্ষে তখন তিনি প্রযোজনা- পরিচালনায় আসেন। তিনি যে সব ছবি পরিচালনা করেছেন সেগুলি অন্যধারার ছবি। এ প্রসঙ্গে 'রাজাসাজা' ও 'মরুতীর্থ হিংলাজ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিকাশ রায় পরিচালিত আর একটি উল্লেখযোগ্য ছবি প্রমথনাথ বিশির 'কেরী সাহেবের মুন্সী'। এই ছবিতে রামরাম বসুর ভূমিকায় তিনি অভিনয়ও করেন। তাঁর প্রিয় শিল্পীদের মধ্যে মঞ্জু দে, উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়— তাঁর প্রায় সব ছবিতেই অভিনয় করেছেন।

শুধুমাত্র চলচ্চিত্রেই নয়, তিনি তাঁর অসামান্য অভিনয়-দক্ষতা, সৃজনশীলতা এবং সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন অসংখ্য বেতার নাটক ও মঞ্চ নাটকেও। বেতারে তাঁর বাচিক অভিনয় আজও কানে বাজে। বেশকিছু মঞ্চ নাটকেও তিনি অভিনয় করেছেন। এর মধ্যে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'নহবত' নাটকে তাঁর অভিনয়ের কথা বলতে হয়। একটি মাত্র দৃশ্যে তিনি অভিনয় করেন। অথচ ওই নাটকে তাঁর অভিনয় আজও অবিস্মরণীয়। 'নহবত' নাটকটি বারোশো রজনী অভিনীত হয়। যা একটা রেকর্ড। শেষের দিকে কয়েকটি শ্রুতিনাটকে তাঁকে মঞ্চে অভিনয় করতে দেখেছি।

বাংলা চলচ্চিত্র জগতে সকলের প্রিয় এই মানুষটির জন্মশতবর্ষে তাঁর অভিনয় ও সৃজনশীলতাকে প্রণাম জানাই। ■

**শব্দরূপ-৭৬৭** ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

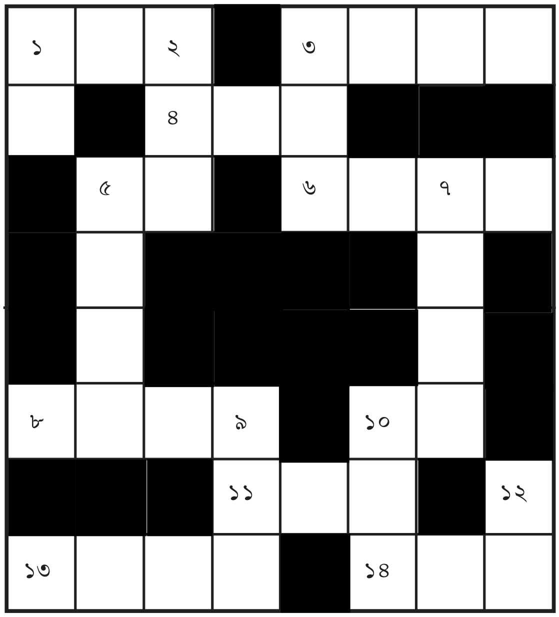


## সূত্র :

**পাশাপাশি :** **১.** 'দৈত্যকুলে—' (প্রবাদ), **৩.** যে আপন সংসারের দোষত্রুটি পরকে জানিয়ে সংসারের অহিত করে ('—বিভীষণ'), **৪.** কৈকেয়ীর কুব্জা দাসী, **৫.** গাঢ়; মেঘ, **৬.** বরুণের অস্ত্র, এর সাহায্যে শত্রুকে বন্ধন করা যায়, **৮.** চাঁদমারির জন্য মাটির উচ্চস্তূপ, **১০.** বনজাত, বুনো, **১১.** তন্ত্রীযুক্ত বাদ্যযন্ত্র বিশেষ; তানপুরা, **১৩.** বিবাহের সম্বন্ধকরণ, **১৪.** সূর্যপত্নী ছায়া; সূর্যকন্যা।

**উপর-নীচ :** **১.** নিশ্চয়জ্ঞান, প্রমিতি; আধ্যাত্মিক সম্পদ, **২.** ভারতের একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, **৩.** উচ্চবংশীয়, **৫.** অপদার্থ, অযোগ্য রাজকর্মচারী, **৭.** কৃষ্ণের শঙ্খ, **৯.** ইন্দ্রের সারথি, **১০.** ভাগ্য, **১২.** দক্ষকন্যা, ভগবতী।

**সমাধান**
**শব্দরূপ-৭৬৪**
**<u>সঠিক উত্তরদাতা</u>**
**শেখর দাস**
**কৃষ্ণপল্লী, মালদা**
**বাবুরাম টুডু**
**কোটশিলা, পুরুলিয়া**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ক | থ | ক |
| | মা | ন্দা | স | | র্বু | | পা |
| আ | | | ফ | লা | র | | ল |
| কা | দ | স্ব | রী | | | | কু |
| শ | | | | অ | পো | গ | ণ্ড |
| কু | | ত্রি | শ | ঙ্কু | | | লা |
| সু | | ফ | | শ | ক্র | ঘ্ন | |
| ম | স | লা | | | | | |

*শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।*
*খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।*

৭৬৭ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৪ ডিসেম্বর ২০১৫ সংখ্যায়

# লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

# ।। চিত্রকথা ।। বিক্রমাদিত্য ।। ৭

## ভারতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে যোগ সম্মেলন

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** আগামী জানুয়ারি মাসে ভারতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে যোগ গবেষণার উপর আন্তর্জাতিক সম্মেলন। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা যেমন মানুষের নিত্যদিনের সঙ্গী ডায়াবেটিস থেকে শুরু করে মানসিক স্বাস্থ্য, এমনকী ক্যান্সারের ক্ষেত্রেও যোগের আশ্চর্য ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকটি সকলের সামনে তুলে ধরা— জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং এই সম্মেলনের সংগঠকগণ। পাঁচদিনের এই সম্মেলনে যোগ বিশারদ, ভারতবর্ষের পারম্পরিক চিকিৎসা প্রথার বিশেষজ্ঞগণ, গবেষক এবং আধুনিক ওষুধ বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত থাকবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

স্বামী বিবেকানন্দ যোগ অনুসন্ধান সংস্থানের চ্যান্সেলর এইচ আর নাগেন্দ্র বলেছেন, ডায়াবেটিস, হাঁপানি, স্তনক্যান্সার, নির্দিষ্ট কিছু মানসিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে যোগের কার্যকারিতা প্রমাণিত বিষয় বলে গণ্য করা যেতে পারে। নিমহ্যান্সের মনোবিদ সিজোফ্রেনিয়া রোগের ক্ষেত্রেও মূলধারার চিকিৎসার পাশাপাশি যোগেরও গুরুত্ব রয়েছে বলে জানিয়েছেন। ভারতের স্বাস্থ্যবিভাগ এবং ট্র্যাডিশনাল সিস্টেম অফ মেডিসিন অ্যান্ড যোগমন্ত্রক এই সম্মেলনের অন্যতম সংগঠক। এই সম্মেলন ফলপ্রসূ হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা।

## ভারতে উচ্চশিক্ষার হার বেড়েছে

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল অ্যান্ড সেনসাস কমিশনার কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। মিডিল, ম্যাট্রিক বা সেকেন্ডারি, হায়ার সেকেন্ডারি বা সিনিয়র সেকেন্ডারি এবং গ্র্যাজুয়েট বা তদূর্ধ্ব স্তরে পাঠরত শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত জনগণের তালিকাভুক্ত করা হয়। তবে এর পাশাপাশি লক্ষণীয়ভাবে কমে গেছে প্রাথমিকে শিক্ষার হার। নিম্ন প্রাথমিকে গত আদমসুমারির থেকে সাম্প্রতিক সুমারি অনুযায়ী শিক্ষার হার কমেছে ৯.৬৭ শতাংশ। প্রাথমিকে কমেছে ১.১৩ শতাংশ। তবে শিক্ষার্থীসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবথেকে বেশি মিডিল স্তরেই (১৫.৭ শতাংশ)। স্নাতক ও তদূর্ধ্বস্তরে এই হার ২.১২ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪.৫ শতাংশ হয়েছে।

২০১১-র সেন্সাস অনুযায়ী ৫৫.৫ মিলিয়ন প্রান্তিক শ্রমিকদের মধ্যে ৩৯.৪ শতাংশ শিক্ষিত। ৩৭.৬ শতাংশ মাধ্যমিকের গণ্ডি টপকাতে পারেনি এবং ১৪.৫ শতাংশ মাধ্যমিক স্তর উত্তীর্ণ কিন্তু স্নাতক স্তর পার করতে পারেনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের মতে, ''উচ্চশিক্ষা স্তরে উন্নতি চিহ্নিত করছে ২০০১-২০১১ দশকের মধ্যে শিক্ষার অগ্রগতিকে।''

## ভারতে মাত্র ৩৯ শতাংশ রেলপথে বৈদ্যুতিকরণ ঘটেছে

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যাতায়াতের জন্য গরিব, মধ্যবিত্ত ও ধনীর এক সহজলভ্য, সুলভ মাধ্যম হলো রেল পরিবহণ। ভারতে ১৮৫৩-তে রেলের পথচলা শুরু হয়, তারপর ১৯২৫ শে কয়লা থেকে ইলেকট্রিকে রূপান্তর ঘটে তার। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত ৩৮৮ কিলোমিটার রেলওয়ে লাইনের বৈদ্যুতিকরণ ঘটে। ১৯৫৭ সালে রেলওয়ে ২৫ কেভি এসি ট্র্যাকশন সিস্টেম করার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে বৈদ্যুতিকরণের একটা অন্যতম সমস্যা হলো বিভিন্ন বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানী ডিভিশনের পার্থক্যে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক চার্জ নেয়।

ভারতে সর্বমোট ৬৫,৮০৮ কিলোমিটার রেলপথের মাত্র ৩৯.৯২ শতাংশের বৈদ্যুতিকরণ ঘটেছে। এখনও পর্যন্ত রেলওয়ের সব থেকে বেশী বৈদ্যুতিকরণ ঘটেছে কেরলে। এখানে সর্বমোট ৯৭৮ কিলোমিটার রেলপথের ৮৯.৩ শতাংশে বৈদ্যুতিকরণ ঘটেছে। পশ্চিমবঙ্গের ৪,০৭০ কিলোমিটার রেলপথের ৬২.৭ শতাংশ বিদ্যুতের ব্যবহার হচ্ছে। সবথেকে কম বৈদ্যুতিকরণ হয়েছে হিমাচল প্রদেশের। এখানে সর্বমোট ২৯৬ কিলোমিটার রেলপথের মাত্র ৫.১ শতাংশের বৈদ্যুতিকরণ সম্ভবপর হয়েছে।

## যোগ নিয়ে গবেষণা শুরু হতে চলেছে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** অল ইন্ডিয়া মুসলিম পারসোনাল ল' বোর্ড-এর বিরোধিতা সত্ত্বেও আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির সাইকোলজি বিভাগ 'যোগ অ্যান্ড স্পিরিচুয়ালিটি'-র উপর ডক্টরাল থিসিস প্রচলন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সাইকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান হাফিজ মোহম্মদ ইলিয়াস এ বিষয়ে ধর্মীয় বিতর্কের প্রসঙ্গ এড়িয়ে বলেছেন, 'যোগ এখন নতুন ট্রেন্ড...আমরা এটাতে ধর্মীয় রঙ লাগাচ্ছি না। এটা শরীরকে সুস্থ রাখতে এবং মনকে সতেজ রাখতে সাহায্য করে, যদি এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করি, তবে ক্ষতি কিসের?' হাফিজ ইলিয়াস গত ৭-৮ নভেম্বর আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে জাতীয় স্তরে একটি সেমিনারের আয়োজন করেছিলেন এবং শীঘ্রই এই বিষয়ে আন্তর্জাতিক স্তরের সেমিনার আয়োজনে সচেষ্ট আছেন। এ এম ইউ-এর ভাইস চ্যান্সেলর প্রাক্তন লেফটেন্যান্ট জেনারেল জামিরুদ্দিন শাহ্ বলেন, 'যোগ এবং আধ্যাত্মের উপর কোনো ধর্মের একচেটিয়া অধিকার নেই। আমি নিজে ৪৩ বছর ধরে যোগ অনুশীলন করছি। ঐশ্বরিক সুখ ও সম্পূর্ণ সুস্থ থাকার উপায় হলো যোগ।'

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
23 November - 2015 - Rs. 10.00

দাম : ১০.০০ টাকা